রবীন্দ্রনাথ

গোলাম মুরশিদ

# রবীন্দ্রনাথের নারী

**পরিবার ও সমাজে বাঙালি নারীদের বর্তমান অবস্থান দেখে কল্পনা করা কঠিন যে, মাত্র এক শ/দেড় শ বছর আগে খাঁচার পাখির মতো তাঁদের বন্দী থাকতে হতো অন্দরমহলে। বাইরের লোকদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের তো প্রশ্নই ওঠে না,** দিনের বেলা স্বামীর সঙ্গে দেখা করাও তাঁদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। বাপের বাড়ি ছাড়া কোথাও যাওয়ার অধিকার ছিল না। এমনকি, লেখাপড়াও নিষিদ্ধ ছিল তাঁদের জন্য। কারণ, মনে করা হতো, লেখাপড়া শিখলে তাঁরা অবাধ্য হয়ে উঠবেন এবং স্বামী অথবা গুরুজনদের অমান্য করবেন। এসব ছাড়া, বেশির ভাগ নারী-পুরুষই তখন বিশ্বাস করতেন, মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে সংসারের অমঙ্গল হবে—তার চেয়েও ভয়ানক—তাঁরা বিধবা হবেন।

বাঙালি সমাজে নারী-পুরুষ উভয়ের মন থেকে নারীদের সম্পর্কে এসব ভ্রান্ত ও হীন ধারণা দূর হতে সময় লেগেছে দেড় শ বছরের বেশি। ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টায় অথবা এক ধাপে তা সম্ভব হয়নি। নারীদের শিক্ষাদান এবং তারপর অবরোধ মোচন করে তাঁদের যাঁরা আধুনিক করে তোলেন, তাঁদের মধ্যে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের নাম সবার আগে মনে পড়া স্বাভাবিক। তবে সে পরিবারেও এক দিনে তা সম্ভব হয়নি—শিক্ষা লাভ করে এই পরিবারের নারী-সদস্যদের অন্তঃপুরের বাইরে যেতে সময় লেগেছিল উনিশ শতকের পুরো দ্বিতীয় ভাগ। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত তাতে কম-বেশি অবদান রেখেছিলেন। তাঁরা যে সবাই একই দৃষ্টিকোণ থেকে নারীমুক্তি সম্পর্কে ভেবেছিলেন অথবা তাতে সমান সহায়তা দিয়েছিলেন, তা নয়। তা ছাড়া, তাঁদের চিন্তাধারার মধ্যেও অনেক স্ববিরোধিতা ছিল।

ভারতবর্ষের আধুনিকতার অন্যতম প্রধান পথিকৃৎ ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। তিনি স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু বাস্তবে নিজের পরিবারে তা প্রয়োগ করতে সমর্থ হননি। তার সূচনা করেছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবেন্দ্রনাথ। তিনি নিজের কন্যা ও পুত্রবধূদের শিক্ষার আয়োজন করেছিলেন। তবে তার থেকে বেশি কিছু নয়। তাঁর থেকে অনেক বেশি অগ্রসর ছিলেন তাঁর পুত্ররা। এমনকি, পরিবারের নারী সদস্যরাও এ ব্যাপারে সামনের দিকে এগিয়ে এসেছিলেন সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে। কেবল পুরুষদের প্রয়াসে এই উদ্যোগ সফল হতো না। তবে দেবেন্দ্রনাথের পুত্র-কন্যা-পুত্রবধূদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছিলেন তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ। তাঁর এই অবদানের স্বরূপ, বিবর্তন ও স্ববিরোধিতা বর্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। তাঁর চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য বোঝার জন্য পরিবারের অন্য সদস্যরা এ বিষয়ে কী ভেবেছিলেন, তা তলিয়ে দেখা প্রয়োজন।

## দেবেন্দ্রনাথ

স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপারে ঔদার্য দেখালেও নারীদের অবরোধমোচনের ঘোর বিরোধী ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এমনকি, ব্রাহ্মসমাজের সাপ্তাহিক উপাসনার সময়ও তাঁদের প্রকাশ্যে আসার তিনি তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। এই নিয়ে ব্রাহ্মদের মধ্যে দারুণ বিতর্কের সূচনা হয় ১৮৬৬ সালে এবং তার ফলে শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও তিনি কোনো আপস করেননি। জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথও পিতার মতোই অবরোধমোচনের বিরোধী ছিলেন। ফলে প্রথম দিকে এই পরিবারের নারীরা সামান্য লেখাপড়া শিখলেও ঐতিহ্যিক সংস্কৃতির মধ্যেই তাঁরা মানুষ হয়েছিলেন। ১৮৬০-এর দশকের আগে পর্যন্ত জীবনযাত্রা ও মূল্যবোধের দিক দিয়ে তাঁরা কলকাতা নগরের অন্য শিক্ষিত পরিবারের চেয়ে বড় একটা আলাদা হয়ে ওঠেননি।

## সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানন্দিনী

এই অবস্থায় বড় রকমের পরিবর্তন আসে দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ এবং তাঁর স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে ঘিরে। বাঙালি সমাজে কোনো নমুনা না থাকা সত্ত্বেও, তরুণ বয়সেই সত্যেন্দ্রনাথ নারীমুক্তির প্রেরণা লাভ করেছিলেন। কোথা থেকে তিনি এই ধারণা ও আদর্শ পেয়েছিলেন, তা জানা যায় না। কিন্তু যেখান থেকেই তিনি এই দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করে থাকুন না কেন, সিভিল সার্ভিস প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য ১৮৬২ সালে বিলেতে যাওয়ার আগে থেকেই তিনি পুরোনো মূল্যবোধে বিশ্বাস হারাতে আরম্ভ করেন। তাই তিনি সেকালে যেসব পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে কেবল দুঃসাহসী নয়, পাগলামো বলে মনে হতে পারে। যেমন—তাঁর বালিকা স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী লজ্জায় একেবারে নির্বাক হয়ে গেলেও, একবার রাতের বেলা সবার অজ্ঞাতে তাঁর সঙ্গে তিনি গোপনে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন বন্ধু মনোমোহন ঘোষের। তারপর বিলেতে গিয়ে সেখানকার সমাজ ও পরিবারে নারীদের উন্নত অবস্থান এবং পুরুষের সঙ্গে তাঁদের মেলামেশা করতে দেখে আরও উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। এই পরিবেশেই তিনি স্ত্রীকে লন্ডনে পাঠিয়ে দেওয়ার অতি অবিশ্বাস্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন তাঁর পিতার কাছে। দেবেন্দ্রনাথ পুত্রের এই অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য আবদার রক্ষা না করলেও সত্যেন্দ্রনাথের উৎসাহে ভাটা পড়েনি।

দেশীয়দের মধ্যে প্রথম সিভিল সার্ভেন্ট হয়ে তিনি দেশে ফিরে আসেন ১৮৬৪ সালের অক্টোবর মাসে। দেশে এসেই, অভিজাতদের মধ্যে এ যাবৎ যা কেউ করতে পারেননি, নারীমুক্তির তেমন কয়েকটি সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন তিনি। যেমন—কিশোরী স্ত্রীকে তিনি আপন কর্মস্থান আহমেদাবাদে নিয়ে যান। আজকের দিনে এটা শুনতে সহজ ও স্বাভাবিক মনে হলেও, সেকালে তা মোটেই তেমন ছিল না। কারণ, তখনকার মূল্যবোধ ও রীতি অনুযায়ী স্ত্রীকে শ্বশুরবাড়িতে রাখাই নিয়ম ছিল। পোশাকের সমস্যা দূর করা যদি বা সম্ভব হয়, স্ত্রীকে পৈতৃক ভবনে রেখে যাওয়ার সেকালের রীতি ভঙ্গ করা সহজ ছিল না। জ্ঞানদা দেবীকে আহমেদাবাদে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে পরিবারের কারও সমর্থন ছিল না, দেবেন্দ্রনাথের তো নয়ই। তবু তাঁকে তাঁর সংকল্প থেকে নিবৃত্ত করে রাশভারী পিতাও প্রথম আইসিএস পুত্রকে ক্ষুণ্ন করতে চাননি।

জোড়াসাঁকোর বাড়ি থেকে জ্ঞানদা কী করে জাহাজে যাবেন, তাও সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। কারণ, সত্যেন্দ্রনাথ তাঁকে ঘোড়ার গাড়িতে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেকালে মেয়েদের জন্য ঘোড়ার গাড়িতে চড়া একেবারে বারণ ছিল। তাই শেষ পর্যন্ত তাঁকে পালকিতে করে নিয়ে যাওয়া

হয়। কর্মস্থানে তাঁকে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আরেকটা বাধা ছিল পোশাক। এটা শুনে এখন অবাক হওয়ারই কথা। কিন্তু তখন মেয়েদের পোশাক বলতে বোঝাত শুধু একটি শাড়ি। সেই মিহি শাড়িসর্বস্ব পোশাক পরে বাইরের লোকের সামনে যাওয়া তো দূরের কথা, বাড়ির ভেতরে কোনো পুরুষের সামনে যাওয়াও চলত না। শীতের দিনে শাড়ির ওপরে মেয়েরা পরতেন একটি চাদর। বাঙালি নারীদের মধ্যে পেটিকোট আর ব্লাউজ পরা তখনো চালু হয়নি। জুতা ও মোজা পরার রীতিও তখন ছিল না। রবীন্দ্রনাথ নিজেই ১৯৩৬ সালে লেখা একটি প্রবন্ধে মেয়েদের এই পোশাক পরার সেকেলে সংস্কারের কথা বলেছেন যে, সেই এক বস্ত্রের দিনে সেমিজ পরাটাও নির্লজ্জতার লক্ষণ ছিল। এমনকি, মেয়েদের ছাতা ব্যবহারও লজ্জার কারণ ছিল।

তাই স্ত্রীকে নিয়ে যাওয়ার আগে তাঁর জন্য সত্যেন্দ্রনাথকে বাইরে যাওয়ার উপযোগী একটা পোশাক উদ্ভাবন করতে হয়েছিল। এতে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন কলকাতার এক ফরাসি দর্জি। তিনি জ্ঞানদা দেবীর পোশাক বানিয়ে দিয়েছিলেন। সে পোশাক এতই জটিল ছিল যে, তা পরার জন্য সত্যেন্দ্রনাথ প্রতিবার সাহায্য করতেন। বোম্বাই গিয়ে জ্ঞানদা যে অভিজাত পরিবারে ছিলেন, তার নারীদের শাড়ি পরার ভঙ্গি দেখে তাকে বাঙালিদের উপযোগী করে নিয়েছিলেন। পশ্চিম ভারতে শাড়ি পরার সময় আঁচলটা থাকে ডান কাঁধের ওপর। সেটা পাল্টে, অর্থাৎ আঁচলটা ডান দিকে রেখে আর সেই সঙ্গে ব্লাউজ ও পেটিকোট পরে তিনি নতুন একটা পোশাক উদ্ভাবন করেন বাঙালি নারীর জন্য। এখন বাঙালি নারীরা যে ভঙ্গিতে শাড়ি পরেন, তা তিনিই প্রবর্তন করেন।

দুই বছর পর তিনি যখন কলকাতায় ফিরে আসেন, তখন ফিরে আসেন তাঁর নতুন পোশাকে। তা ছাড়া, দুঃসাহসিক একটা কাণ্ড করেন কাউকে না জানিয়ে—জাহাজ থেকে গাড়িতে চড়ে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে এসে। 'দুঃসাহসিক' কথাটা শুনে এখন হাসি পেতে পারে। কিন্তু সেটা এতই অসাধারণ ব্যাপার ছিল যে, সেই সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বাড়ির তাবৎ সদস্য এতে ক্ষুব্ধ হন; বিশেষ করে, দেবেন্দ্রনাথ এতে এতই ক্রুদ্ধ হন যে, কয়েক বছর তিনি পুত্রবধূর সঙ্গে বাক্যালাপ করেননি। না করারই কথা; কারণ, তিনি যখন পালকিতে করে তাঁর বড় কন্যা সৌদামিনীকে বেথুন স্কুলে পাঠান (১৮৪৯), তখন খোলা পালকিতে করে যেতেন বলে সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্যরা এর সমালোচনা করতেন। এ কথা রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন এ ঘটনার ৮৮ বছর পরে।

এখানেই শেষ নয়, প্রবল সামাজিক নিষেধ অমান্য করে সত্যেন্দ্রনাথ এরপর জ্ঞানদা দেবীকে একাকী গভর্নর জেনারেলের ভোজসভায় পাঠিয়েছিলেন (১৮৬৭) এবং সন্তানদের নিয়ে গর্ভবতী অবস্থায় তাঁকে পাঠিয়েছিলেন (১৮৭৭) ইউরোপে। সেখানে—ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডে—তিনি আড়াই বছর বাস করেন। তখন তিনি ইংরেজি ও ফরাসি ভাষাও শেখেন। পরের দশকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মঞ্চে অভিনয় করেছিলেন (অক্টোবর, ১৮৯০) *রাজা ও রানী* নাটকে।

জ্ঞানদা দেবীকে পড়ালেখা শেখানোর জন্য সত্যেন্দ্রনাথ কেবল প্রাইভেট শিক্ষিকা নিয়োগ করেননি, তিনি নিজেও তাঁর লেখাপড়ার তদারক করতেন সব সময়। তাঁকে লেখা চিঠিগুলো থেকে দেখা যায়, তাঁকে তিনি সুনির্বাচিত ইংরেজি ও বাংলা বই কিনে দিতেন। পড়ায় সাহায্য করতেন এবং যখন জ্ঞানদা দেবী তাঁর কাছ থেকে দূরে থাকতেন, তখন চিঠি লিখে কী পড়তে হবে, তার নির্দেশ দিতেন।

পরে তিনি কন্যা ইন্দিরা দেবীকেও উচ্চশিক্ষা দিয়েছিলেন এবং পছন্দ করে স্বামী নির্বাচন করার অধিকার দিয়েছিলেন। তাঁদের কন্যা সেকালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৮৯২ সালে বিএ পাস করেছিলেন ফরাসি ভাষায় প্রথম শ্রেণীর অনার্সসহ। তা ছাড়া, কন্যাকে তিনি পুরোপুরি স্বাধীনতা দিয়েছিলেন স্বামী নির্বাচনে। ১৮৯৯ সালে—সাতাশ বছর বয়সে—তিনি প্রমথ চৌধুরীকে বিয়ে করেছিলেন।

## জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও কাদম্বরী দেবী

সত্যেন্দ্রনাথের এহেন সাহসী ও অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত পরিবারের অন্য কেউই পুরোপুরি অনুসরণ করতে পারেননি। কিন্তু তাঁর প্রভাব আংশিকভাবে পড়েছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আর রবীন্দ্রনাথের ওপর। তবে স্বীকার করতে হবে যে, তাঁরা দুজন দেবেন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রভাবও সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারেননি। মনোভাব ও জীবনে তাই তাঁরা খানিকটা দোটানায় পড়েছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রথম দিকে কত রক্ষণশীল ছিলেন, তা বোঝা যায় ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত তাঁর *কিঞ্চিৎ জলযোগ* প্রহসন থেকে। এতে তিনি নারীদের শিক্ষা, অবরোধমোচন এবং পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশাকে উপহাস করেছিলেন। অবশ্য তারপর ধীরে ধীরে তিনি নিজেই খুব আধুনিক হয়ে উঠেছিলেন। এমন আধুনিক যে, সবার পিলে চমকে দিয়ে স্ত্রীকে নিয়ে তিনি গড়ের মাঠে ঘোড়ায় চড়েছিলেন। কিন্তু তিনি নারীমুক্তির আদর্শ কতটা আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন, তা বিতর্কের বিষয়।

## রবীন্দ্রনাথ

সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ—উভয়ই নারীমুক্তির দিকে যেসব পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, তা নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের জন্মের পরে। এই দুজনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যতটা ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন, অন্য ভাইবোনদের কারও সঙ্গে তা হননি। সেদিক থেকে নারীভাবনায় তাঁদের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের আরও অগ্রসর হওয়ার কথা ছিল। তবে সত্যেন্দ্রনাথ যেসব অচলায়তন ভাঙার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, তার বেশির ভাগই করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ যখন একেবারে বালক, তখন। তা ছাড়া, তিনি বেশির ভাগ সময়ই কাটাতেন জোড়াসাঁকো থেকে অনেক দূরে—তাঁর কর্মস্থান পশ্চিম ভারতে, আর কলকাতায় থাকলে তাঁর ভাড়া করা বাড়িতে। কাজেই সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তাঁর কৈশোরে ও যৌবনে; বাল্যকালে নয়। অপর পক্ষে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে তিনি বাল্যকাল থেকেই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। তদুপরি, সাত বছর বয়স থেকে তিনি খেলার সঙ্গী হিসেবে পেয়েছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী কাদম্বরী দেবীকে। কাদম্বরী ছিলেন তাঁর চেয়ে দুই বছরের বড়। রবীন্দ্রমানস গঠনে তাঁর প্রভাব ছিল ব্যাপক ও গভীর। প্রকৃতপক্ষে, বড় হয়ে ওঠার পথে তিনি কাছ থেকে দেখেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ আর জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পরিবারকেই। তাই পিতৃগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও, তাঁর জীবনে এই দুই ভাই এবং তাঁদের স্ত্রীদের প্রভাব ও অনুপ্রেরণা ছিল সীমাহীন।

পরিবারের সদস্যরা ছাড়া, তাঁর ওপর বাইরের প্রভাবও পড়েছিল প্রথম যৌবন থেকে। মাত্র সাড়ে সতেরো বছর বয়সে তিনি বিলেতে গিয়েছিলেন আইসিএস প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে। শেষ পর্যন্ত এ পরীক্ষার প্রস্তুতি না নিলেও, তিনি লেখাপড়ার সূত্রে সেখানে বাস করেছিলেন দেড় বছর। যাওয়ার পথে তিনি বোম্বাইতে আত্মারাম পাণ্ডুরঙের, অর্থাৎ আনা তরখড়ের পরিবারে ছিলেন তিন-চার সপ্তাহ। সত্যেন্দ্রনাথ আশা করেছিলেন যে, এই পরিবারে তিনি যথেষ্ট পরিমাণে ইংরেজ সমাজের আদব-কায়দা শিখতে পারবেন; বিশেষ করে, পরিবারের কনিষ্ঠ কন্যা আনার কাছ থেকে। শিখেওছিলেন। আনা ছিলেন বিলেতে শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং দারুণ পাশ্চাত্য-প্রভাবিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রেমে পড়েছিলেন। খুব সম্ভব সেটাই ছিল তাঁর প্রথম প্রণয়। কাজেই সাধারণভাবে তিন-চার সপ্তাহে যেটুকু প্রভাব পড়তে পারে, রবীন্দ্রনাথের ওপর আনার প্রভাব পড়েছিল তার চেয়ে বেশি।

বোম্বাইতে নারীমুক্তির নমুনা দেখলেও তার চেয়ে অনেক বেশি দেখেছিলেন ইংল্যান্ডে। সেখানে তিনি ইংরেজ পরিবার ও সমাজে নারীদের যে মর্যাদা লক্ষ করেছিলেন, তা তাঁকে বিশেষ করে ভাবিয়েছিল, এমনকি, উদ্বুদ্ধ করেছিল। এককথায় বললে বলতে হয়, এই সমাজে নারী-পুরুষের মেলামেশা এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। ইংল্যান্ডে থাকার সময়ে তিনি সেখান থেকে যেসব চিঠিপত্র লিখেছিলেন, তা থেকে তাঁর এই মুগ্ধদৃষ্টি সহজেই লক্ষ করা যায়।

মেয়েপুরুষ একত্রে মিলে আমোদ প্রমোদ করাই ত স্বাভাবিক। মেয়েরা ত মনুষ্যজাতির অন্তর্গত, ঈশ্বর ত তাঁদের সমাজের একাংশ করে সৃষ্টি কোরেছেন। মানুষে মানুষে আমোদ প্রমোদে মেলামেশি করাকে একটা মহাপাতক, সমাজবিরুদ্ধ, রোমাঞ্চজনক ব্যাপার করে কোরে তোলা শুদ্ধ অস্বাভাবিক নয়, তা অসামাজিক, সুতরাং এক হিসেবে অসভ্য। পুরুষেরা বাইরের সমস্ত আমোদ প্রমোদে লিপ্ত রয়েছে, আর মেয়েরা তাঁদের নিজস্ব সম্পত্তি একটা পোষা প্রাণীর মত অন্তঃপুরের দেয়ালের শৃঙ্খলে বাঁধা আছে।...এ সকল যদি পাপ না হয় তবে নরহত্যা করাও পাপ নয়; সমাজের অর্ধেক মানুষকে পশু কোরে ফেলা যদি ঈশ্বরের অভিপ্রেত বোলে প্রচার কর, তা হলে তাঁর নামের অপমান করা হয়। মেয়েদের সমাজ থেকে নির্বাসিত কোরে দিয়ে আমরা কতটা সুখ এবং উন্নতি থেকে বঞ্চিত হই, তা বিলেতের সমাজে এলে বোঝা যায়। ('য়োরোপযাত্রী কোনো বঙ্গীয় যুবকের পত্র', *ভারতী*, অগ্রহায়ণ ১২৮৬, পৃ. ৩৫৮।)

এ চিঠিটি তিনি লিখেছিলেন বিলেতে প্রায় এক বছর বাস করার পর। তিনি তখন যা বিশ্বাস করতেন, স্পষ্ট ভাষায় এতে তিনি প্রকাশ করেছেন। তাঁর বক্তব্যে কোনো দ্ব্যর্থতা অথবা ভদ্রতার ভণ্ডামি নেই। 'অসামাজিক', 'অসভ্য', 'পাপ', ঈশ্বরের 'নামের অপমান'—এসব উক্তি অত্যন্ত কঠোর। দেবেন্দ্রনাথ যা বিশ্বাস করতেন এবং বাস্তব জীবনে যা প্রচার করতেন—এসব বিবৃতি সরাসরি তার ঔদ্ধত্যপূর্ণ বিরোধিতা। পিতা এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতাসহ তাঁর আত্মীয়রা আঠারো বছরের রবীন্দ্রনাথের এহেন চিঠি পড়ে বিচলিত হন। অতঃপর আইসিএস অথবা ব্যারিস্টার কিছুই না হয়ে, এই চিঠি লেখার চার মাসের মধ্যেই তাঁকে দেশে ফিরতে হয়েছিল, সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে, ১৮৮০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে।

ফিরে আসার আগের আট মাস তিনি বাস করেছিলেন জন স্কটের পরিবারে। এ পরিবারে তিনটি অবিবাহিত কন্যা ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছোট দুই বোনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল; বিশেষ করে, কনিষ্ঠ কন্যা লুসির সঙ্গে কবির যে সম্পর্ক হয়েছিল, তাকে প্রণয় সম্পর্ক বলাই সমীচীন। এও তাঁকে নারীপুরুষের মেলামেশা সম্পর্কে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়েছিল। কিন্তু আঠারো-উনিশ বছর বয়সে তিনি যে প্রগতিশীল মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন, পরে তা বজায় রাখতে পারেননি।

বিলেত থেকে ফেরার পর প্রথম দুই দশকে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে তিনি খানিকটা রক্ষণশীলতারই পরিচয় দিয়েছিলেন। এ সময়ে তিনি স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষে লন্ডন থেকে যেমনটা লিখেছিলেন, তেমন কোনো উচ্চকণ্ঠ বিবৃতি দেননি, অন্তত তাঁর রচনায় তার কোনো প্রতিফলন দেখা যায় না। দেবেন্দ্রনাথ অথবা দ্বিজেন্দ্রনাথ—কেউ তাঁকে ভর্ৎসনা করেছিলেন কি না, জানা যায় না। তদুপরি, ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এ সময়ে রোমান্টিক আবেশে এমন নিমগ্ন ছিলেন যে, কাব্য অথবা গান ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারেননি। কাদম্বরী বৌঠানের সঙ্গে প্রণয়, একটি অশিক্ষিত ও অপ্রাপ্তবয়স্ক গ্রাম্য মেয়ের সঙ্গে বিবাহ এবং বৌঠানের আত্মহত্যা—ইত্যাদিও তাঁকে কম আবদ্ধ করে রাখেনি। তবে তা সত্ত্বেও *বাল্মীকি-প্রতিভা*, *কালমৃগয়া* এবং *রাজা ও রানী*র অভিনয়ে বাড়ির মেয়েদের অন্তর্ভুক্ত করে তিনি নারীমুক্তির সাহসী দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। তখন পর্যন্ত ভদ্রঘরের কোনো বাঙালি রমণী নাটকের অভিনয়ে অংশ নেননি। বাস্তব জীবনে এ রকমের ছোটখাটো ভূমিকা পালন করলেও, নারীদের প্রতি তিনি সত্যিকার সহানুভূতি ও দরদ প্রকাশ করেছিলেন আরও পরে লেখা সৃজনশীল রচনায়।

সজ্ঞানে নারীদের প্রতি সমাজের নির্যাতন দেখাতে চেয়েছিলেন কি না, তা স্পষ্ট না হলেও, কিন্তু তাঁর প্রথম দিকের রচনার মধ্যে—বিশেষ করে ছোটগল্পে—নারীদের প্রতি সমাজের নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পেয়েছিল অভ্রান্তরূপে। এসব মর্মান্তিক চিত্র সাধারণভাবে নারীদের প্রতি তাঁর পাঠকের সহানুভূতি জাগিয়ে তুলেছিল। সমাজের রক্ষণশীলতার দরুন নারীদের কীভাবে নিপীড়নের শিকারে পরিণত হতে হয়—আরও পরে একদিকে গল্প-উপন্যাস-নাটকে তিনি তার করুণ কাহিনি বর্ণনা করেছিলেন, অন্যদিকে কোনো কোনো রচনায় প্রতিতুলনা হিসেবে তিনি এঁকেছিলেন আধুনিকাদের ছবি।

যেমন—বাল্যবিধবাদের করুণ চিত্র দেখা যায় তাঁর একেবারে প্রথম দিকের লেখা *করুণা* (১৮৭৭-৭৮) উপন্যাসের মোহিনী চরিত্রে। কুসুমকেও দেখতে পাই 'ঘাটের কথা'য় (১৮৮৪)। ১৮৯১ সালে রচিত *প্রজাপতির নির্বন্ধ*-এর শৈলবালা, ১৮৯২ সালে লেখা 'ত্যাগ' গল্পের কুসুম এবং ১৮৯৫ সালে লেখা 'অতিথি' গল্পের সোনামণিও বালবিধবা। 'দৃষ্টিদান' ও 'কঙ্কাল' (১৮৯৩) গল্পে এবং *চোখের বালি* (১৯০৩), *গোরা* (১৯১০) ও *চতুরঙ্গ* (১৯১৬) উপন্যাসেও তিনি বাল্যবিধবাদের চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। 'কঙ্কাল' গল্পের নায়িকাকে তিনি রচনা করেছিলেন সব সৌন্দর্য দিয়ে এবং তার চেয়েও বড় কথা, নিজের দরদ দিয়ে। কিন্তু ভাইয়ের বন্ধু এক ডাক্তার তার সঙ্গে প্রেম করতে রাজি হলেও বিয়ে করতে প্রস্তুত নয়। বিয়ের দিন নায়িকা প্রথম ডাক্তারকে দিয়ে, তারপর নিজেও বিষ পান করে আত্মহত্যা করে। এসব চরিত্র বালবৈধব্যের সমস্যার প্রতি পাঠককে সচেতন করে তোলাই স্বাভাবিক।

কেবল বাল্যকালে বিধবা হওয়ার মর্মান্তিক দুঃখ নয়, একান্নবর্তী পরিবারে নারীদের যে হৃদয়স্পর্শী নিগ্রহ ও নিপীড়ন সহ্য করতে হয়, তারও দরদি চিত্র অঙ্কন করেছিলেন তিনি। দৃষ্টান্ত হিসেবে 'দেনাপাওনা' (১৮৯১) গল্পের নিরুপমাকে মনে পড়া খুবই স্বাভাবিক। অত্যন্ত সুন্দরী এই কিশোরীকে খুবই পছন্দ হয়েছিল তার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট স্বামীর। কিন্তু তার পিতা পণের টাকা দিতে না পারায় নিরুপমা বাপের বাড়ি যাওয়ার অধিকার পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছিল। তার পিতাকেও নিদারুণ অপমান সহ্য করতে হয়। কিন্তু যা একেবারে নিষ্করুণ, তা হলো, শেষ পর্যন্ত সে মারা যায় বিনা চিকিৎসায়। যেকোনো সংবেদনশীল পাঠকই ব্যথিত হবেন গল্পটি পড়ে। ১৮৯১ সালের পর তাঁর ছোটগল্প ও কবিতার মোড় ফেরার একটা প্রধান কারণ—এ সময়ে তিনি বাংলার সমাজকে দেখতে পেয়েছিলেন তার একেবারে ভেতরে বসে।

'ত্যাগ' গল্পের কুসুম—সেকালের জন্য যা ছিল ব্যতিক্রমী—তার ভাবী স্বামীর প্রণয় লাভ করেছিল। বিয়ের আগে এবং তার পরেও স্বামী হেমন্ত তার প্রেমে হাবুডুবু খেতে থাকে। কিন্তু কুসুম নিম্নবর্ণের শুনে তার শ্বশুর পুত্রকে হুকুম দিয়েছিল কুসুমকে ত্যাগ করতে। বাধ্যগত পুত্রের মতো হেমন্তও তাকে ত্যাগ করতেই উদ্যত হয়। তবে শেষ মুহূর্তে জয়ী হয় তার প্রণয়। এই গল্পের মধ্য দিয়ে পাঠক একদিকে কুসুমের বেদনা দিয়ে বিগলিত হন, অন্যদিকে শেষ পর্যন্ত প্রেমের জয় দেখে আশ্বস্ত হন। এই বেদনা ও আনন্দ—উভয়ই একান্নবর্তিতার নিষ্ঠুরতার প্রতি পাঠককে সচেতন করে তোলে।

সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে রবীন্দ্রনাথ নিজে নারীদের সম্পর্কে রক্ষণশীলতা যতটা কাটিয়ে উঠেছিলেন, তাঁর অঙ্কিত নারীরাও তত আধুনিক হয়ে উঠেছে। কেবল নারী নয়, তারা যে মানুষ এবং তাদেরও একটা ব্যক্তিত্ব থাকতে পারে—এই চেতনা তাদের মধ্যে ক্রমশ দানা বেঁধেছে। সে জন্য *চোখের বালি*র বিনোদিনী থেকে আরম্ভ করে তাঁর নারীরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। *চোখের বালি*র পর *নৌকাডুবি* ছিল

একটা ব্যতিক্রম, উপন্যাস হিসেবেও বৈশিষ্ট্যবর্জিত; নয়তো *গোরা, ঘরে-বাইরে, চতুরঙ্গ, যোগাযোগ, শেষের কবিতা, দুইবোন* ও *চার অধ্যায়*—প্রতিটি উপন্যাস সম্পর্কেই এ কথা কমবেশি প্রযোজ্য।

কেবল উপন্যাস নয়, ছোটগল্প অথবা কাহিনি-কবিতার সীমিত পরিসরেও তিনি এমন এক-একটা চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন, যারা প্রচলিত রীতিনীতি অবজ্ঞা করে আপন দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে ওঠে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 'স্ত্রীর পত্র'-এর মৃণাল। কিন্তু প্রথম দিকের গল্প 'দেনাপাওনা'র নিরুপমাও উল্লেখযোগ্য, যদিও তার প্রতিবাদের ধরন আলাদা। 'শাস্তি'র (১৮৯৩) চন্দরারও। কিন্তু তাদের নীরব আত্মত্যাগও পাঠকের কাছে সোচ্চার প্রতিবাদের বক্তব্য তুলে ধরে। একান্নবর্তী পরিবারের নিষ্পেষণ 'অপরিচিতা' ও 'হৈমন্তী' গল্পের কল্যাণী ও হৈমন্তীও বিনা প্রতিবাদে পরিবার অথবা সমাজের অন্যায় সিদ্ধান্ত মেনে নেয় না। অথবা, ধরা যাক, 'নিষ্কৃতি' কবিতার মঞ্জুলী। বৈধব্যকে অস্বীকার করে সে বিয়েই করে ফেলে তার ডাক্তার প্রেমিককে।

তবে স্বীকার করতেই হবে যে, 'স্ত্রীর পত্র'র মৃণাল একান্নবর্তিতার প্রতি সবচেয়ে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। তার বিয়ে হয়েছিল একটা বড় পরিবারে। সেখানে সে তিলে তিলে নিজের ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু পনেরো বছর বিনা প্রতিবাদে সমস্ত অত্যাচার সহ্য করে একদিন সে বিদ্রোহ করে। বাঙালি সমাজের বহুকাল লালিত মূল্যবোধকে অস্বীকার করে সে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধ্বজা উড়িয়ে দেয়। স্বামী ও সংসার ত্যাগ করে একদিন নিজেকে সে দেখতে পায় খোলা আকাশের নিচে। সেখানে মুক্ত হাওয়ায় সে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিতে সমর্থ হয়। রবীন্দ্রনাথ এভাবে বেশ কয়েকটি গল্প ও কবিতায় একান্নবর্তিতার দোষগুলো তুলে ধরেছেন, যদিও বিভিন্ন রচনায় ভিন্ন ভিন্ন পন্থায় তাঁর নারীরা প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে।

প্রথম দিকের এবং পরের দিকের নারীচরিত্রে এই স্পষ্ট পার্থক্যের কারণ বিশ্লেষণ করা খুব কঠিন নয়। তাঁর পিতা দেবেন্দ্রনাথ মারা যান ১৯০৫ সালে। কৈশোর থেকেই তাঁর ওপর পিতা দেবেন্দ্রনাথের প্রভাব পড়েছিল প্রবলভাবে। মাতৃহীন এবং স্কুলের প্রতি আগ্রহহীন কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথকে দেবেন্দ্রনাথ নিজের সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন হিমালয় ও শান্তিনিকেতনের নির্জন, নীরব, প্রশান্ত পরিবেশে। সেখানে তাঁর কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রধানত ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করেছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে লাভ করেছিলেন জ্যোতির্বিজ্ঞানসহ নানা বিদ্যা। প্রকৃতপক্ষে, অন্য পুত্র ও কন্যা—কারও সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ এতটা সময় কাটিয়েছিলেন কি না, সন্দেহ আছে। তাই তাঁর ওপর পিতার প্রভাব যতটা পড়েছিল, সত্যেন্দ্রনাথ অথবা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ওপর ততটা পড়েনি। ফলে অন্য সন্তানদের কেউ রবীন্দ্রনাথের মতো এমন পিতৃগ্রস্ত ছিলেন না।

ধর্মের ব্যাপারে দেবেন্দ্রনাথ সংস্কারবাদী ও আধুনিক হলেও, তাঁর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল রক্ষণশীল। এ বিষয়ে তিনি বলতে গেলে অনড় ও আপসহীন ছিলেন। আনা তরখড়কে নিয়ে তাঁর পিতা আত্মারাম পাণ্ডুরঙ কলকাতায় এসেছিলেন ১৮৭৯ সালে। উদ্দেশ্য : রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কন্যার সম্ভাব্য বিবাহ। কিন্তু পাণ্ডুরঙকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হয়েছিল—পাতে-পাতে মেলেনি বলে। দ্বিতীয় কারণ : আন্তপ্রাদেশিক বিবাহ তখনো চালু হয়নি বলে। তাঁর জীবদ্দশায় রবীন্দ্রনাথ তাঁকে কখনো অস্বীকার করতে পারেননি, অথবা করেননি।

যেমন—১৯১০ সালে পুত্র রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন বালবিধবা প্রতিমা দেবীর। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ জীবিত থাকলে সেটা সম্ভব হতো না। এর মাত্র বছর দশেক আগে তিনি বলেন্দ্রনাথ অকালে মারা গেলে, তাঁর স্ত্রী সুশীলা দেবীকে তাঁর পিতা এসে নিয়ে যান এলাহাবাদে। কন্যাকে তিনি বিয়ে দেওয়ার কথা ভাবতে থাকেন। এর পরপরই তিনি মারা যান। কিন্তু বিয়ের পরিকল্পনা চলতে থাকে। খবর পেয়ে দেবেন্দ্রনাথ তা ঠেকানোর জন্য সুশীলা দেবীকে জোড়াসাঁকোয় নিয়ে আসার জন্য পাঠান রবীন্দ্রনাথকে। অনুগত পুত্র হিসেবে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে কলকাতায় নিয়ে আসেন। এ থেকে দেবেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ—উভয়ের মনোভাবই খানিকটা বোঝা যায়। কাজেই, পিতা জীবিত থাকলে রবীন্দ্রনাথ পুত্রের সঙ্গে বিধবার বিবাহ দিতে পারতেন না। এ কেবল আনুষ্ঠানিক বাধা অথবা পিতৃ-আদেশ নয়, এ রীতিমতো মনোভাব ও বিশ্বাসের ব্যাপার। হয়তো সে জন্যই ১৯০৩ সালে রচিত *চোখের বালির* বিনোদিনী প্রেমে পড়লেও তার বিয়ে দিতে পারেননি; কিন্তু ১৯১৭-১৮ সালে লেখা 'নিষ্কৃতি' কবিতায় পিতা ও সমাজকে অগ্রাহ্য করে মঞ্জুলী বিয়ে করেছিল। বস্তুত, ১৯০৫ সালের পরবর্তী রবীন্দ্রনাথ আর তার পূর্ববর্তী রবীন্দ্রনাথে অনেক পার্থক্য, বিশেষ করে সামাজিক ভাবনার দিক দিয়ে।

নোবেল পুরস্কার পাওয়ার (১৯১৩) বিষয়টিও তাঁর জীবনে এমনই একটা গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। রবীন্দ্রমানস একটা বড় রকমের মোড় নিয়েছিল এই পুরস্কার পাওয়ার পর। তিনি যেসব কথা বলতে এতকাল সম্ভবত ভরসা পেতেন না এবং যেসব সামাজিক অচলায়তনে আঘাত দিতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন, নোবেল পুরস্কার তাঁকে সেসব কথা বলার এবং সমাজের চিরাচরিত পথে না হাঁটার অথবা আঘাত করার আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছিল। এর ওপর, সেই নতুন-জন্ম-লাভ-করা রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশের অনুকূল পরিবেশ রচনা করেছিলেন প্রমথ চৌধুরী তাঁর মাসিক *সবুজপত্র* প্রকাশ করে (১৯১৪)। এর পরই এবং এই পত্রিকার পাতায় তিনি লিখেছিলেন 'স্ত্রীর পত্র', 'অপরিচিতা' ও 'হৈমন্তী'র মতো ছোটগল্প আর *ঘরে বাইরে* এবং *চতুরঙ্গ*-এর মতো উপন্যাস।

সাধু ভাষার পরিবর্তে চলিত ভাষায় গল্প ও প্রবন্ধও তিনি লিখেছিলেন এই পত্রিকার পাতায়। তাঁর এই পদক্ষেপের ফলে বাংলা গদ্যসাহিত্যের ভাষাই পাল্টে গেল। অন্যরাও ধীরে ধীরে সাহিত্যের মাধ্যম হিসেবে চলিত ভাষাই ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন। *সবুজপত্র* উঠে গেলেও, তাঁর রচনার এই বলিষ্ঠতা পরেও বজায় ছিল। *চার অধ্যায়, যোগাযোগ, চার অধ্যায়, শেষের কবিতা, দুইবোন* ইত্যাদি উপন্যাস তার প্রমাণ। এমনকি, *মুক্তধারা, কালের যাত্রা* এবং *রক্তকরবীর* মতো নাটকও তিনি লিখেছিলেন নোবেল পুরস্কার-উত্তরকালে।

পিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে দীর্ঘসময় কাটানো ছাড়াও, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন পিতার কড়া শাসনে চালিত একটি বিরাট যৌথ পরিবারের সদস্য। এই পরিবারে তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর প্রতি— প্রধানত, তাঁর আধুনিক জীবনযাত্রার প্রতি—সংসারের অনেক সদস্য কী রকম আন্তরিকতাবর্জিত মনোভাব দেখান। তা ছাড়া দেখেছিলেন কিশোরী এবং তারপর তরুণী বধূ কাদম্বরী দেবীর প্রতি সমগ্র পরিবারের সহানুভূতিহীন আচরণ, এমনকি অবহেলা ও তাচ্ছিল্য। তার প্রধান কারণ, তাঁর পিতা ছিলেন ওই পরিবারেরই স্বল্প বেতনের একজন কর্মচারী। তিনি দেখতে শ্যামলা হলেও সুন্দরী ছিলেন। নিজের চেষ্টাতেই শিক্ষা ও বৈদগ্ধ্য অর্জন করেছিলেন, এবং করেছিলেন অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি। তাঁর উদ্ভিন্ন যৌবনকালে স্বামী তাঁকে নিয়ে গড়ের মাঠে ঘোড়ায় চড়ার মতো চমক-লাগানো দু-একটা ঘটনাও ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু স্বামীর কাছ থেকে আন্তরিক ভালোবাসা সামান্যই পেয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করে তিনি জীবন জুড়িয়েছিলেন।

এমনকি, রবীন্দ্রনাথের স্ত্রী মৃণালিনী দেবীও জোড়াসাঁকোর একান্নবর্তী পরিবারে আদৌ সুখী ছিলেন না। তিনিও তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনের বেশির ভাগ সময় কাটাতে বাধ্য হন শিলাইদহ ও শান্তিনিকেতনে। বিদ্রোহ ঘোষণা করে সত্যেন্দ্রনাথের মতো ভাড়াবাড়িতে বাস করার মতো সিদ্ধান্ত রবীন্দ্রনাথ নিতে পারেননি। সে রকমের আর্থিক সচ্ছলতা তাঁর ছিল না। পিতাকে অসন্তুষ্ট করার মতো মনমানসিকতাও ছিল না। তাই একান্নবর্তী পরিবারের তাবৎ অত্যাচার তিনি এবং তাঁর স্ত্রী নীরবে সহ্য করেছিলেন। কিন্তু, অনুমান করি, মনে মনে তাঁরা দুজনই এই প্রথাকে ঘৃণা করতে শিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের রচনাতে তার প্রতিফলন ঘটেছিল।

বাড়িতে ছেলেবেলা থেকে বালক রবীন্দ্রনাথ তাঁর মা ও সৌদামিনী দেবীসহ দিদিদের দেখেছিলেন পর্দার অন্তরালে অবরুদ্ধ। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম অথবা উন্নত হিন্দু—যা-ই হন না কেন, তাঁর স্ত্রী ছিলেন ষোলোআনা ঐতিহ্যবাদী হিন্দু। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, গঙ্গাস্নান করলে পুণ্য হয়। তাই মাঝেমধ্যে গঙ্গাস্নান করতে চাইতেন। কিন্তু কঠোর অবরোধপ্রথার কারণে তিনি ঘেরাটোপ দেওয়া পালকিতে যেতেন এবং ভৃত্যরা তাঁকে পালকিসুদ্ধ গঙ্গায় চুবিয়ে নিয়ে আসত। রবীন্দ্রনাথ তখনো বালক ছিলেন, কিন্তু নিশ্চয়ই এ কথা শুনে থাকবেন এবং অতি স্পর্শকাতর বালক হিসেবে এই প্রথাকে মনে মনে ঘৃণা করে থাকবেন। তা ছাড়া, নিজের বাড়ি ও সত্যেন্দ্রনাথের বাড়ির পরিবেশে যে পার্থক্য, তা-ও তিনি অনুভব করে থাকবেন।

তাঁর ছোটগল্প ও উপন্যাসে সে জন্য তিনি পর্দাপ্রথার উল্লেখ করেননি। ধীরে ধীরে তিনি তাঁর নায়িকাদের মুক্তি দিয়েছিলেন অবরোধের কঠোর বন্ধন থেকে। *চোখের বালির* বিনোদিনী ও *গোরার* চরিত্রগুলো থেকে আরম্ভ করে তাঁর নায়িকারা সবাই কমবেশি অবরোধমুক্ত। কেউ কেউ এ ব্যাপারে রীতিমতো বেপরোয়া; বিশেষ করে, তাঁর শেষের দিকের গল্প ও উপন্যাস সম্পর্কে এই মন্তব্য বেশি প্রযোজ্য। তাঁর এ সময়কার নায়িকারা বন্ধুদের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করে এবং যৌন বিষয়সহ তাবৎ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করে। এ বিষয়ে যাদের কথা মনে পড়ে, তারা হলো 'রবিবারে'র (১৯৩৯) বিভা, *শেষের কবিতার* (১৯২৯) কেতকী ও লাবণ্য, 'প্রগতিসংহার'-এর (১৯৪১) সুরীতি, আর 'ল্যাবরেটরি'র (১৯৪০) সোহিনী ও মীরা। *চার অধ্যায়*-এর (১৯৩৪) এলা যেভাবে তার বন্ধু অতীনকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করে এবং নিহত হওয়ার পূর্বমুহূর্তে আকস্মিক আবেগে তার বক্ষ নগ্ন করে, তাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে তার এ আচরণ ছিল একেবার অপ্রত্যাশিত ও প্রথাবিরোধী। সোহিনী ও তার কন্যা নীলা যে ধরনের জীবন যাপন করে, তা-ও এ প্রসঙ্গে কম উল্লেখযোগ্য নয়। তাদের অবিশ্বাস্য রকমের গোঁড়ামিবর্জিত বলে মনে হতে পারে।

এ কথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথ এসব চরিত্র অঙ্কন করেছিলেন জীবনের শেষ ভাগে। বিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে বাঙালি নারীদের জীবনযাত্রায় আধুনিকতার যে অসামান্য প্রভাব পড়ে, তার আলোকে এসব চরিত্রকে এখন যুগান্তকারী বলে মনে নাও হতে পারে। কিন্তু ১৯৩০-৪০-এর দশকে এ রকম চরিত্র অত্যাধুনিক বলে গণ্য হতো। সমাজের পরিবর্তন রবীন্দ্রনাথ সব সময়ে ভালো করেই লক্ষ করতেন এবং তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাঁর রচনাকে আধুনিক করে তুলতেন। ১৯২৫ থেকে ১৯৩৬ সালের মধ্যে লেখা তাঁর তিনটি প্রবন্ধেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তনের স্পষ্ট ছাপ লক্ষ করি। পরিবার ও সমাজে নারীর অবস্থান অত্যন্ত নিচে এবং তাদের সেই অধীনতাকে স্থায়ী করার জন্য পুরুষ নানা উপায় অবলম্বন করেছে, সে কথা বলেছিলেন স্পষ্ট করেই।

যেমন, ১৯২৫ সালে লেখা 'হিন্দুবিবাহ' প্রবন্ধে নারীকে বন্দী করে রাখার কথা বলেছেন : নারীকে 'পুরুষ লোভের দ্বারা আপন ব্যক্তিগত ভোগের পথেই...বিষয় সম্পত্তির মতো নিজের ঈর্ষাবেষ্টিত সংকীর্ণ ব্যবহারের মধ্যে বন্ধ করেছে'। এর নয় বছর পর লেখা আরেকটি প্রবন্ধে বলেছেন, একটা সময় ছিল যখন 'মানব সভ্যতার ব্যবস্থাভার ছিল পুরুষের হাতে। এই সভ্যতার রাষ্ট্রতন্ত্র অর্থনীতি সমাজশাসনতন্ত্র গড়েছিল পুরুষ'। সেই সুবাদে 'আমাদের একমাত্র অবাধ অধিকারের ক্ষেত্র আমাদের স্ত্রী। আমরা মন্ত্র পড়ে...আমাদের স্ত্রীকে আমাদের দেবত্র সম্পত্তি করে বসে আছি'। নানাভাবে পুরুষ আপনার সেই একচ্ছত্র কর্তৃত্বকে স্থায়ী করে ধরে রাখতে চেয়েছে। বিবাহের মাধ্যমেও। বিবাহ প্রতিষ্ঠানটাও তাঁর মতে এমনি নারীকে শোষণ করার একটি সামাজিক হাতিয়ার। 'বিবাহ এখনো সকল দেশেই ন্যূনাধিক পরিমাণে নারীকে বন্দী করে রাখার পিঞ্জর। তার পাহারাওয়ালা পুরুষ প্রভুত্বের তকমা পরা।'

১৯২৮ সালে লেখা 'নারীর মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে নারীর ওপর পুরুষের এই সর্বব্যাপী কর্তৃত্বের একটা কারণও ব্যাখ্যা করেছেন। এর ফলাফল যে পুরুষের জন্যই লোকসানের, তাও বলেছেন : '...সমাজের বহুযুগের চর্চায় মেয়েদের ভিতরকার শক্তি জিনিসটা খইয়ে খইয়ে খুইয়ে খুইয়ে দেওয়া হলো।...সংসারযাত্রায় স্বভাবতই মেয়েদের হওয়া উচিত ছিলো পুরুষের অনকূল, তা না হয়ে সে হলো ভার।' এর সমাধান নারীকে স্বাবলম্বী করে তোলা। 'আজ এল এমন যুগ যখন মেয়েরা মানবত্বের পূর্ণ মূল্য দাবি করেছে। জননার্থং মহাভাগা বলে তাদের গণনা করা হবে না। সম্পূর্ণ ব্যক্তিবিশেষ বলেই তারা হবে গণ্য।...কৃত্রিম বন্ধন-মুক্ত মেয়েরা যখন আপন পূর্ণ মনুষ্যত্বের মহিমা লাভ করবে তখন পুরুষও পাবে আপন পূর্ণতা।'

সমাজ যে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে এবং সেই সঙ্গে মেয়েরাও, তা বলেছেন ১৯৩৬ সালে লেখা একটি প্রবন্ধে : 'প্রাকৃতিক কারণে নদীতে জলধারার পরিমাণ যদি বেড়ে যায় তবে তার তটভূমির সীমা আপনিই হটে যায়। মেয়েদের জীবনে আজ সকল দিক থেকেই স্বতই তার তটের সীমা দূরে সরে যাচ্ছে।' 'আধুনিক মেয়েদের মন ঘরের সমাজ ছাড়িয়ে প্রতিদিনই বিশ্বসমাজে উত্তীর্ণ হচ্ছে।...ঘরের মেয়েরা প্রতিদিন বিশ্বের মেয়ে হয়ে দেখা দিচ্ছে।...কেবল ঘোমটাটা খসল তা নয়,...মনের ঘোমটাটাও তাদের খসছে।' ফলে ভেঙে যাচ্ছে পুরুষদের 'একেশ্বর শাসনকর্তাদের' মনোভাব। কিন্তু নয় বছর পরে বিবাহে পুরুষের প্রভুত্বও খর্ব হয়ে এসেছে, তা লক্ষ করেছেন : 'গার্হস্থ্য বাজার-দরেই মেয়েদের দর, এমন কথা আজকের দিনে বিয়ের বাজারে ষোলো-আনা খাটছে না।'

বাল্যবিবাহের ব্যাপারেও তিনি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিলেন। এর একটা কারণ এই যে, তিনি নিজেও ছিলেন বাল্যবিবাহের শিকার। তিনি ছিলেন তখনকার কলকাতার সবচেয়ে অভিজাত ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত একটি পরিবারের সদস্য। অত্যন্ত সুদর্শন ও রোমান্টিক কবি। তার ওপর তিনি বিলেতের সমাজে নারীদের উন্নত অবস্থান লক্ষ করেছিলেন এবং তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন। সেই তাঁর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত, নিরক্ষর এবং সাংস্কৃতিক বৈদগ্ধ্য-বর্জিত এগারো বছরের একটি গ্রাম্য বালিকার। বিয়ের আগে তিনি তাঁকে দেখেননি ঠিকই। কিন্তু দেখলেও, কন্যাটি যেমনই হন না কেন, পিতার আদেশ ও বউদিদের পছন্দ তিনি অগ্রাহ্য করতে পারতেন না। মানসিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তিনি ছিলেন পিতার ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। তদুপরি, তিনি গড়ে উঠেছিলেন পিতার ছাঁচে। তাই তিনি 'বাধ্য হয়ে বিয়ে করেছিলেন' না বলে বরং বলা উচিত, তিনি বিয়ে করেছিলেন নিজের সম্মতিতেই। এটা বোঝা যায় বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে তিনি কৌতুক ও ভালো লাগা মিশ্রিত যে অভিনব নিমন্ত্রণপত্র পাঠিয়েছিলেন, তা থেকে। কিন্তু তাঁর পরবর্তী আচরণ থেকে মনে হয় না যে, কনেকে দেখে অথবা বিয়ে করে তিনি উল্লসিত হয়েছিলেন অথবা খুব সুখী হয়েছিলেন।

কনেটিকে কবির উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য বিয়ের পর তাঁর নামসহ ভবতারিণী দেবীর আমূল সংস্কার করা হয়েছিল। তাঁর নতুন কাব্যিক নাম হলো মৃণালিনী। বই-খাতা কিনে দেওয়াই নয়, প্রাইভেট টিউটর রাখা হলো এবং তাঁকে পাঠানো হলো অভিজাত লোরেটো স্কুলে, যেখানে তিনি লেখাপড়া শিখেছিলেন প্রায় দুই বছর। বাংলা ছাড়াও তিনি সংস্কৃত শেখেন, খানিকটা ইংরেজিও। তাঁকে গানও শেখানোর চেষ্টা চলে। একবার তিনি নাটকের অভিনয়েও অংশ নিয়েছিলেন।

এত সব সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রত্যাশিত সঙ্গিনীকে—বিশেষ করে মননশীল সঙ্গিনীকে—তাঁর স্ত্রীর মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং জানা যায়, অত্যন্ত কর্তব্যপরায়ণ ও সহানুভূতিশীল স্বামী হয়ে উঠলেও তিনি স্ত্রীর সত্যিকার দোসর হয়ে ওঠেননি। সে তুলনায় ইন্দিরা দেবীর মধ্যে তিনি এক বন্ধু ও এক অন্তরঙ্গ সঙ্গিনীর পরিচয় পেয়েছিলেন। নারীদের মধ্যে তিনি সব সময় সাংস্কৃতিক বৈদগ্ধ্য ও প্রতিভার দীপ্তি দেখতে চাইতেন। আনা তরখড় ও ল্যুসি স্কটের প্রতি তিনি যে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, সে কেবল তাঁদের প্রগল্‌ভতার জন্য নয়, বরং তাঁদের

সাংস্কৃতিক গুণাবলিও তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। এ ছাড়া নিজের পরিবারে তিনি ভালোবেসেছিলেন কাদম্বরী দেবীকে। কাদম্বরী তাঁর বৈদগ্ধ্য ও গুণাবলি দিয়ে কবির সাহিত্যিক প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তিনি তাঁকে ভাবতে অনুপ্রাণিত করতে পারতেন। ইন্দিরা দেবীর বৈদগ্ধ্য ও সংগীতও তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। এ ছাড়া, প্রতিভা দেবীর সংগীত ও অভিনয়নৈপুণ্য এবং জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর আধুনিকতা ও অভিনয়ে দক্ষতাকে তিনি দেখেছিলেন সপ্রশংস দৃষ্টিতে। কাজেই স্ত্রীর ব্যাপারে মনে মনে অপূর্ণতার বেদনা তাঁর ছিলই।

এ সত্ত্বেও তাঁর প্রথম দিকের রচনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তিনি বাল্যবিবাহের দেশাচারকে মেনে নিয়েছিলেন। ১৯০৫-এর আগে যেসব রচনা প্রকাশ করেছিলেন, বেশির ভাগেরই নায়িকারা হয় বালিকা, নয়তো বয়ঃসন্ধিকালে উপনীত কিশোরী। অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে, এ সময়ে সমাজে যেসব বিয়ে হতো, তার পাত্রপাত্রী উভয়ই বাল্যবয়সী না হলেও পাত্রীরা প্রায় সবাই হতো বালিকা। এ ছাড়া, অধিকাংশই নিরক্ষর এবং বিবাহপূর্ব প্রণয় সম্পর্কে অজ্ঞ। সুতরাং তিনি হঠাৎ যুবতী অথবা উচ্চশিক্ষিত পাত্রীর চিত্র অঙ্কন করলে সেটা বাস্তবসম্মত হতো না। তাঁর আগে বঙ্কিমচন্দ্রকেও এ কারণে নায়িকা নির্বাচন করতে হয়েছে হয় বিধবা নয়তো অস্বাভাবিক অবস্থায় লালিত মেয়েদের। রোহণী যেমন, অথবা কপালকুণ্ডলা যেমন।

তাঁর প্রথম যুবতী নায়িকা *নৌকাডুবি*র হেমনলিনী। তার কারণ, সে ব্রাহ্ম। ব্রাহ্মদের মধ্যে মেয়েদের শিক্ষাদানের এবং প্রাপ্তবয়স্ক হলে বিয়ে দেওয়ার রীতি কয়েক দশক আগেই প্রচলিত হয়েছিল। ১৮৭২ সালের ব্রাহ্মবিবাহ আইন অনুযায়ী ষোলো বছরের আগে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া নিষিদ্ধ ছিল। দেবেন্দ্রনাথের আদি ব্রাহ্মসমাজে এ আইন মানা না হলেও, কেশব সেন পরিচালিত নববিধান সমাজ এবং শিবনাথ শাস্ত্রী ও তাঁর বন্ধুদের পরিচালিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে এ আইন অনুসারেই বিয়ে হতো।

*গোরা* উপন্যাসের (১৯১০) সুচরিতা হেমনলিনীর চেয়েও আধুনিকা। সে রবীন্দ্রনাথের প্রথম সত্যিকার 'শিক্ষিত' ও 'বিদগ্ধ' নায়িকা। অবশ্যও সেও ব্রাহ্ম। এটি বেশ লক্ষ করার বিষয় যে, এ উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে *প্রবাসী*তে প্রকাশিত হওয়ার সময় তিনি সুচরিতাকে মাত্র ১৪-১৫ বছর বয়সী বলে উল্লেখ করলেও গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার সময় তার বয়স একটু বাড়িয়ে ১৭-১৮ করেছিলেন। সুচরিতার ছোট বোন ললিতাকেও তার কথাবার্তা থেকে বেশ পরিণত মনে হয়, যদিও রবীন্দ্রনাথ তার বয়স ১৩-১৪ বলে উল্লেখ করেছেন। বস্তুত, নায়িকাদের বয়সের ব্যাপারে *নৌকাডুবি* থেকে আরম্ভ করে বয়সের দিক দিয়ে একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ করা যায়, যা 'রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যের নায়িকাদের বয়সের ছক' থেকে পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

ওপরের তালিকাটি দীর্ঘ, কিন্তু এ থেকে স্পষ্ট দেখা যায়, কীভাবে ১৯০০ সালের পরে তাঁর নায়িকাদের বয়স বাড়তে আরম্ভ করল। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফলে বাল্যবিবাহ সম্পর্কে তাঁর বিকর্ষণ দেখা দিয়েছিল আরও আগে। বিয়ের বছর তিনেক পরে ১৮৮৭ সালে তিনি চন্দ্রনাথ বসু ও অক্ষয়কুমার সরকারের প্রতিবাদে 'হিন্দুবিবাহ' নামে যে ভাষণ দেন, তাতে বাল্যবিবাহের নিন্দা এবং যৌবনবিবাহের প্রতি তাঁর সমর্থন ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু যা বিস্ময়ের ব্যাপার, তা হলো—এ ভাষণ দিলেন যে বছর, সেই বছরেই তাঁর প্রথম সন্তান মাধুরীলতার জন্ম হয়। কিন্তু তাঁর বয়স ১৪ বছর হওয়ার আগে থেকেই তিনি তাঁর বিয়ের আয়োজন করতে আরম্ভ করেন এবং প্রায় এক বছর ধরে উৎকণ্ঠিত আলোচনার পর ১৪ বছর ৮ মাসের সময় তাঁকে বিয়ে দেন নিজের থেকে নয় বছরের ছোট একজন পরিণত ব্যক্তির সঙ্গে। তিনি কন্যার কোনো মতামত নিয়েছিলেন বলে কোনো লিখিত প্রমাণ মেলে না। তাঁর 'ভাষণ' তত্ত্ব হিসেবেই থেকে যায়। তাঁর জীবনে সেটা তিনি প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হন।

তাঁর ব্যর্থতার আরও বড় পরিচয় তিনি দেন মাধুরীলতার বিয়ের এক মাস চব্বিশ দিন পরে—দ্বিতীয় কন্যা রেণুকার বিয়ে দিয়ে। তাঁকে বিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর সাড়ে দশ বছর বয়সে। কারণ, তিনি যে পাত্রটিকে পেয়েছিলেন, তাঁকে তাঁর কাছে সুপাত্র মনে হয়েছিল। এ সম্পর্কে জগদীশচন্দ্র বসুকে দেওয়া কৈফিয়তে তিনি যা বলেছিলেন, তা হলো, 'একটি ডাক্তার বলিল, বিবাহ করিব—আমি বলিলাম কর। যেদিন কথা তাহার তিনদিন পরেই বিবাহ সমাধা হইয়া গেল।...ছেলেটি ভাল, বিনয়ী, কৃতী।' এই এলএমএফ ডাক্তার পাত্রটির বয়স যে রেণুকার চেয়ে প্রায় তিন গুণ বেশি এবং বিয়ের পর তাঁকে যে ডাক্তারি পড়ার জন্য বিদেশে পাঠানোর খরচ দিতে হবে, এ তথ্য তিনি অবশ্য জগদীশচন্দ্রকে দেননি। বস্তুত, তিনি যে কৈফিয়ত দিয়েছিলেন, তা নিতান্তই খোঁড়া। তবে তাঁর সাফাই দিয়ে যা বলা যায়, তা হলো, তাড়াহুড়ো করে বিয়ে দেওয়ার একটি সম্ভাব্য কারণ থাকা অসম্ভব নয়। সে হলো, বাড়ির সব ছেলেমেয়ের বিয়ের খরচই বহন করতেন দেবেন্দ্রনাথ। এ বিয়ে দেওয়ার সময়, ১৯০২ সালে—তাঁর স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ দেখা দিয়েছিল। সেই আশঙ্কায় বাড়িতে বিয়ের ধুম পড়ে যায়।

এর একটা দৃষ্টান্ত হলেন সত্যেন্দ্রনাথ। সব ব্যাপারেই তিনি ছিলেন স্বাবলম্বী। কিন্তু তাঁর কন্যা ইন্দিরা দেবীর বিয়ের খরচের জন্য তিনিও নির্ভর করেছিলেন পিতার ওপর। রবীন্দ্রনাথও কন্যার বিয়ের খরচটা পিতার ওপর দিয়ে চালিয়ে দিতে চেয়েছিলেন বলে মনে করলে তা অমূলক নাও হতে পারে। কিন্তু কারণ যা-ই হোক, রেণুকার বিবাহ কবির জীবনের একটা কলঙ্ক বলে মনে হতে পারে। বেচারী রেণুকাকে অবশ্য পরবর্তী জীবনে বিশেষ দুঃখ পেতে হয়নি। কারণ, বিয়ের মাস দেড়েক পর তাঁর স্বামী ইংল্যান্ডে চলে যান এবং ফিরে আসেন কিঞ্চিদধিক এক বছর পরে। রেণুকা মারা যান তার এক বছরের মধ্যে। তার আগে থেকেই তিনি যক্ষ্মায় আক্রান্ত হন। শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে স্বামীর সংসার তাঁকে করতে হয়নি।

এর ছয় বছর পরে—১৯০৭ সালে—রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছোট মেয়ে মীরার বিবাহ দেন সাড়ে তেরো বছর বয়সে। এবারও বিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি রীতিমতো তাড়াহুড়ো করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ মারা গিয়েছিলেন এর প্রায় আড়াই বছর আগে। সুতরাং পিতার প্রভাবে তিনি এ বিয়ে দেননি। স্ত্রীর প্রভাবেও নয়। কারণ, মৃণালিনী দেবী মারা গিয়েছিলেন এর পাঁচ বছর আগে। একে পুরোপুরি কবির সিদ্ধান্ত বলেই গণ্য করতে হয়। এবং এ দিয়ে তাঁর স্ববিরোধিতাই লক্ষ করা যায়।

কিন্তু এই দ্বিধা ও স্ববিরোধের কারণ কী? এক দিকে, তিনি যেমন পিতা ও পরিবারের কাছ থেকে বাল্যবিবাহের ঐতিহ্য লাভ করেছিলেন; অন্য দিকে, নিজের জীবন থেকেও নিশ্চয় শিক্ষা নিয়েছিলেন। অন্তত শিক্ষা নেওয়াই স্বাভাবিক। তাঁর নিজের বিয়ের কথা আগেই উল্লেখ করেছি। তিনি কি অনুভব করেননি যে, অপ্রাপ্তবয়স্ক একটি কন্যাকে বিয়ে করার মধ্যে দারুণ রোমান্টিক কিছু নেই? অন্তত পরবর্তীকালে মৃণালিনী দেবীর সঙ্গে তাঁর কবোষ্ণ সম্পর্ক থেকে এমনটা অনুমান করা অসংগত হবে না যে, তিনি বাল্যবিবাহের খানিকটা ভুক্তভোগী হয়েছিলেন। সুতরাং, নিজের বিয়ে থেকে তাঁর যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল, তা তাঁকে বাল্যবিবাহের প্রতি বিদ্বিষ্ট করে তুললে সেটাই স্বাভাবিক হতো। কিন্তু নিজের কন্যাদের বিয়ে দিতে গিয়ে তিনি যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তা থেকে ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর একধরনের অন্ধ-আনুগত্যই প্রকাশ পায়। অথচ তিনি মীরা দেবীর যখন বিয়ে দেন (১৯০৭), তত দিনে তাঁর রচনায় অবিবাহিত নায়িকারা ১৭-১৮ হতে আরম্ভ করেছিল। কেবল বয়সের বিষয়টিই নয়, তাঁর কন্যারা কেউ সুচরিতা বা ললিতার মতো অবরোধমুক্ত হয়ে পুরুষদের সভায় এসে সপ্রগল্‌ভ আলোচনায়ও অংশ নেননি। এও রবীন্দ্রচরিত্রের একটি বড় স্ববিরোধ।

কন্যাদের বিবাহে তিনি আদর্শের সঙ্গে আরও একটা আপস করেছিলেন। তিনি লিখিত অথবা মৌখিকভাবে কখনো পণপ্রথার সমর্থন করেছেন বলে জানা যায় না। অথচ তিন জামাইকেই তিনি নগদ পণ দিয়েছিলেন এবং তাঁদের বিদেশে পাঠানোর চুক্তিতে রাজি হয়েছিলেন।

এর মধ্যে বড় জামাই শরৎকুমার চক্রবর্তী ছিলেন কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর পুত্র। তদুপরি, তিনি ছিলেন খুব মেধাবী ছাত্র। কাজেই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বিশেষ প্রার্থিত পাত্র বলে বিবেচনা করেছিলেন। এই পাত্র তাঁর কাছে এতই কাঙ্ক্ষিত ছিল যে, তাঁর মা এবং দুই ভাই পণের টাকা আদায় করার ব্যাপারে খুব নীচতার পরিচয় দিলেও প্রায় দশ মাস আলাপ-আলোচনার পর শেষ পর্যন্ত তিনি এ বিয়ে দিয়েছিলেন। পাত্রপক্ষ প্রথমে বিশ হাজার টাকা দাবি করেছিল। পরে সেটা কমিয়ে দশ হাজার টাকায় নামিয়েছিল, যদিও সেই সঙ্গে শর্ত দিয়েছিল যে, পণের টাকাটা নগদ দিতে হবে বিয়ের তিন দিন আগে। পণের টাকা সাধারণত দেবেন্দ্রনাথ দিতেন আশীর্বাদ হিসেবে। সততার জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন। নগদ দেওয়ার দাবি করে তাঁকে অবিশ্বাস করা হচ্ছে বলে তিনি খুব বিরক্ত হয়েছিলেন। বিয়ের সময়ে শরৎকুমারের বয়স ছিল প্রায় তিরিশ বছর—আগেই বলেছি—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের চেয়ে মাত্র নয় বছর কম। তা সত্ত্বেও আন্তরিক প্রয়াস চালিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্গে মাধুরীলতার বিয়ে দিয়েছিলেন। বিয়ের পর ব্যারিস্টার হওয়ার জন্য তাঁকে বিলেতেও পাঠিয়েছিলেন। পণ তিনি তাঁর অন্য দুই জামাতাকেও দিয়েছিলেন। এবং তাঁদেরও উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে যাওয়ার খরচ জুগিয়েছিলেন।

মোটকথা, নিজের কন্যাদের বিবাহ দিতে গিয়ে তিনি বাল্যবিবাহ ও পণপ্রথা মেনে নিয়েছিলেন। তা ছাড়া, পাত্র বেছে নেওয়ার ব্যাপারেও তিনি কন্যাদের কোনো সুযোগ দিয়েছিলেন বলে জানা যায় না। অথচ ১৮৮৭ সালে তিনি 'হিন্দুবিবাহ' বক্তৃতায় সরাসরি মেয়েদের পছন্দমতো বিয়ে দেওয়া উচিত—এ কথা না বললেও একটু বড় বয়সে এবং পছন্দ করে বিবাহের দিকেই নিজের সমর্থন ব্যক্ত করেছিলেন।

সন্ধান করিলেই যে সকল সময়েই সম্পূর্ণ কৃতকার্য হওয়া যাইবে, এমন কোনো কথাই নাই। কিন্তু সন্ধানপূর্বক বিবেচনাপূর্বক সংযতচিত্তে স্ত্রী নির্বাচন করিয়া লওয়া ছাড়া ইহার অন্য পন্থা নাই।...অধিকাংশ লোকেরই স্বভাবভেদে বিশেষ বিশেষ গুণের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ আছে, উক্ত গুণসকল তাহারা স্ত্রীর নিকট হইতে প্রত্যাশা করে; নিরাশ হইলে অনেক সময়ে সমাজে অশান্তি ও অমঙ্গল হয়। অতএব গুণ দেখিয়া স্ত্রী নির্বাচন করিতে হইলে বড়ো বয়সে বিবাহ আবশ্যক।... যেখানে শিক্ষার প্রভাব হইতেছে সেখানে বাল্যবিবাহ আপনিই উঠিতেছে...।

পাত্র বেছে নেওয়ার সুযোগ দিলে বিবাহিত জীবন সুখের হতো—এ কথা বলা যাচ্ছে না। কিন্তু মাধুরীলতার বিবাহ অত্যন্ত দুঃখের হয়েছিল। তাঁর স্বামী শরৎকুমার এবং তাঁর মা ও ভ্রাতারা বিয়ের আগেই যে লোভ ও নীচতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা দেখে পঞ্চমুখে প্রশংসা করা যায় না। বিয়ে হয়তো অসুখেরই হতো। কিন্তু পিতা হিসেবে রবীন্দ্রনাথ যে কন্যাকে পছন্দ করার সুযোগ দেননি, সেই ত্রুটিকে খণ্ডন করা যায় না। তিনি নিজেও এই জামাতার হাতে কম অপমান সহ্য করেননি। ফলে শ্বশুর-জামাই সম্পর্ক ধীরে ধীরে দারুণ তিক্ত হয়ে যায়। আর মাধুরীলতার সঙ্গেও সম্পর্ক প্রথমে তিক্ত হয়; তারপর কার্যত তা ভেঙে যায়।

নিজের কন্যাদের বেলায় রক্ষণশীলতা দেখালেও, তাঁর সাহচর্যে যে নারীরা এসেছিলেন, তাঁদের সম্পর্কে তিনি নিজে কোনো প্রাচীনপন্থী মনোভাব দেখাননি। অভিনয় ও নাচের জন্য অভিজাত পরিবারের নারীদের তিনি মঞ্চে উঠিয়েছিলেন। আর গানে তো কথাই নেই। প্রথম যুগের রবীন্দ্রসংগীতশিল্পীদের বেশির ভাগই তাই মহিলা শিল্পী। বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহ করার জন্য তিনি শান্তিনিকেতনের গায়িকা, নর্তকী ও অভিনেত্রীদের দল নিয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। অবরোধমুক্তি ও জীবনযাত্রার ব্যাপারে তিনি নিজের পরিবার ও অন্য নারীদের মধ্যে এই যে বৈষম্য দেখিয়েছিলেন, তা কি কেবল নিজের মেয়ে ও পরের মেয়ে বলে; নাকি সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিই বদলে গিয়েছিল বলে—তা সঠিকভাবে বলা মুশকিল। প্রসঙ্গত আরও একটা কথা মনে রাখা দরকার, পেশাদার নর্তকীদের বাইরে ভদ্রঘরের মেয়েদের মধ্যে নৃত্যশিল্প প্রবর্তনও তাঁর সাহসী পদক্ষেপের জন্য তখন সম্ভব হয়েছিল। অভিজাত, অসামান্য কবি, গীতিকার, সুরকার, নাট্যকার, ছোটগল্পের লেখক, ঔপন্যাসিক—তাঁর এই বিবিধ পরিচয়ের জন্য এবং সর্বোপরি নোবেল বিজয়ী হিসেবে তিনি সমাজে এমন একটা সর্বজনীন শ্রদ্ধার আসন অধিকার করেছিলেন যে, তাঁর পক্ষে সেকালের মেয়েদের সামনের দিকে এগিয়ে দেওয়া যতটা সহজ ছিল, অন্যদের ক্ষেত্রে তা ছিল না। ১৯২০ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে বাঙালি নারীদের জীবনযাত্রায় যতটা আধুনিক হওয়ার এবং সাংস্কৃতিক বৈদগ্ধ্য অর্জনের পথ তিনি সুগম করে দিয়েছিলেন, সেটা সেকালে অন্য কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি এ পদক্ষেপ না নিলে, বাঙালি নারীদের হয়তো আরও কয়েক দশক পিছিয়ে থাকতে হতো।

তাঁর সৃজনশীল রচনায় নারী-পুরুষের সম্পর্কও বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। তাঁর প্রথম দিকের গল্প-উপন্যাসে এ সম্পর্ক প্রথাগত সমাজের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। একেবারে প্রথম দিকের ছোটগল্প 'দেনাপাওনা' থেকে আরম্ভ করে এর বহু দৃষ্টান্ত আছে। এসব রচনায় নারীহৃদয়ের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আবেগের চিত্র তিনি অঙ্কন করেছেন রেখাচিত্রের মতো, সামান্য কয়েকটা দাগে। সেকালের সমাজে এই রীতি সবার মান্য ছিল যে, বিয়ে করার পর স্বামী কেবল স্ত্রীর দেহ নয়, মনেরও ষোলোআনা অধিকার লাভ করত এবং স্ত্রীরা এটা মেনে নিত বিনা বিতর্কে। কিন্তু তাঁর শেষ দিকের রচনায় নারীরা প্রশ্ন তোলে যে, এই অধিকার ন্যায্য কি না। তারা মনে করে যে, এটা অধিকারের বিষয় নয়—হৃদয় জয় করার বিষয়।

এর অত্যন্ত উজ্জ্বল উদাহরণ পাওয়া যায় *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসে। এই উপন্যাসের নায়ক নিখিলেশ অনেকটা তাঁর নিজের মেজো ভাই সত্যেন্দ্রনাথের আদলে গঠিত। তাঁর মতোই নিখিলেশ নিরক্ষর স্ত্রীকে লেখাপড়া শেখাতে চেষ্টা করে। এর জন্য সে নিয়োগ করে একজন ইউরোপীয় মহিলাকে। এ ছাড়া, জোর করে অধিকার আদায় নয়, নিখিলেশ চেষ্টা করে স্ত্রী বিমলার হৃদয় জয় করতে। জ্ঞানদা দেবীর মতোই বিমলা আধুনিকা হয়ে ওঠে। একদিন বালিকাবধূ জ্ঞানদাকে সত্যেন্দ্রনাথ পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর বন্ধু মনোমোহন ঘোষের সঙ্গে। নিখিলেশ স্ত্রীকে পরিচয় করিয়ে দেয় তার বন্ধু সন্দীপের সঙ্গে। জ্ঞানদা দেবী মনোমোহনের সঙ্গে প্রেমে পড়েননি। এমনকি, বাক্যালাপও করতে পারেননি। কিন্তু বিমলা অচিরেই সন্দীপের প্রেমে পড়ে। সে প্রেম এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যায় যে, স্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্ক ভেঙে যেতে পারত। এবং ভেঙে না গেলেও স্বামীর সঙ্গে তার সম্পর্ক দারুণ সংকটের মুখোমুখি হয়, কিন্তু নিখিলেশ বিচলিত হয় না। সে জানে যে, 'ব্যক্তি নিজেকে আবিষ্কার করতে চাইলে এবং অন্যের সঙ্গে সম্পর্ককে সৃজনশীলভাবে অর্থবহ করে তুলতে চাইলে অবশ্যই ঝুঁকি নিতে হয়।'

রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত আধুনিক নায়িকাদের সঙ্গে গোড়ার দিকের নায়িকাদের একটা পার্থক্য বিশেষভাবে চোখে পড়ে। প্রথম দিকের নায়িকাদের দেখে বোঝা যায় না যে, তারা ভাবছে কি না। অথবা ভাবলেও তাদের ভাবনার কথা জানা যায় না। কিন্তু শেষ দিকের নায়িকাদের দেখে বোঝা যায় যে, তারা স্বাধীনভাবে ভাবতে শিখেছে। তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ লক্ষ করি এসব চরিত্রে। এই নায়িকারা বেশির ভাগই অতৃপ্ত ও অসুখী। তার চেয়েও বড় কথা, তারা ব্যক্তিস্বাধীনতার অন্বেষণে লিপ্ত। *চোখের বালির* বিনোদিনী তাঁর প্রথম দিকেরই নায়িকা। কিন্তু বলতে গেলে তাকে দিয়েই এর সূচনা। শেষ পর্যন্ত অনেক কিছু সে মেনে নিলেও সেকালের বিধবাদের সঙ্গে তার পার্থক্য সুস্পষ্ট। বিনোদিনীর তুলনায় *গোরা* উপন্যাসের আনন্দময়ী, সুচরিতা ও ললিতা অনেক বেশি অগ্রসর। এমনই মৃণালিনী, কল্যাণী, হৈমন্তী, দামিনী, কুমুদিনী, নন্দিনী, এলা ও সোহিনী—সবাই কমবেশি বিকশিত ব্যক্তিত্বের আভায় উজ্জ্বল।

এই নারীদের প্রত্যেকেরই এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে, যা অন্যদের থেকে তাদের স্বতন্ত্র আসনে বসিয়ে দেয়। তাদের সবাই গুরুজন ও প্রচলিত মূল্যবোধকে আপ্তবাক্যের মতো মেনে নিতে রাজি নয়, বরং উভয় সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে। এমনকি, ক্ষেত্রবিশেষে, তারা যে সনাতন মূল্যবোধের ওপর সমাজ দাঁড়িয়ে আছে, তাকেই অস্বীকার করে। যেমন—*যোগাযোগ* উপন্যাসের কুমু শেষ পর্যন্ত নীরবে পরাজয় স্বীকার করে নিলেও স্বামীর সঙ্গে

শয্যায় যেতে রাজি হয় না। *গোরা* উপন্যাসের কিশোরী চরিত্র ললিতা তার পারিবারিক ধর্মকে পর্যন্ত মেনে নিতে অসম্মত হয়। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ১৯০১-০৩ সালে বিনোদিনী চরিত্র অঙ্কিত হলেও অন্য চরিত্রগুলো কোনোটাই ১৯০৭ সালের আগেকার নয়। সত্যি বলতে কি, বেশির ভাগ চরিত্র ১৯১৪ সাল অথবা তার পূর্ববর্তী। তবে এ তাঁর উদ্ভট কল্পনা নয়—এসব চরিত্র সমসাময়িক বাঙালি সমাজে মূল্যবোধের যে পরিবর্তন সূচিত হচ্ছিল, তারই প্রতিফলন। সজ্ঞানে করেছিলেন কি না, বোঝা যায় না; কিন্তু এসব চরিত্র দিয়ে শিক্ষিত নাগরিক সমাজের নারীদের অনেককে তিনি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি লাভে সহায়তা করেছিলেন।

তা সত্ত্বেও নারী যে শুধু পুরুষের সেবিকা, শয্যাসঙ্গিনী, সন্তানের জন্মদাত্রী ও গৃহিণী নয়, বরং সে পুরুষের সমান শরিক—এ ধারণা দীর্ঘকাল রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করতে পারেননি। গোড়ার দিকে তিনিও অন্য পুরুষদের মতো কমবেশি বিশ্বাস করতেন যে, নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র ও ভূমিকা আলাদা। একজন বাইরে থেকে আয় করে আনবে, অন্যজন থাকবে ঘরের মধ্যে এবং সেখানকার কাজকর্ম করবে। তাঁর আদর্শমতে স্ত্রী হলো সত্যিকার অর্থে 'গৃহিণী', পুরুষের প্রকৃত অংশীদার নয়। তার স্থান পুরুষের নিচে। তিনি তাঁর বড় মেয়ে মাধুরীলতাকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, তার উত্তরে তিনি পিতাকে যে চিঠি লেখেন, তা থেকে পিতার মনোভাব প্রকাশ পায়। মাধুরীলতা বিয়ের পরপরই পিতাকে লিখেছিলেন, 'তুমি আমাকে যা যা উপদেশ দিয়েছ, আমি তা প্রাণপণে পালন কর্তে চেষ্টা করব। আমার স্বামী যে আমার চেয়ে সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ এবং আমি যে তাঁর সমান নই এটা বরাবর মনে রাখব।' এই উদ্ধৃতির মূল কথা হলো—'আমি যে তাঁর সমান নই'—তখন অবধি রবীন্দ্রনাথ সেটাই বিশ্বাস করতেন।

এ ধারণা থেকে তিনি বিচলিত হতে আরম্ভ করেন আরও পরে। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের মৃণালিনীর মতো নারীচরিত্রের মাধ্যমে তিনি নারীরা যে কেবল গৃহিণী নয়, মুখ বুজে স্বামী ও গুরুজনদের সব আদেশ পালন করাই যে তার কাজ নয়—এটা দেখাতে আরম্ভ করেন। তারপর সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ধাপে ধাপে তিনি এমন সব গল্প, উপন্যাস, নাটক ও কবিতা রচনা করেন, যাতে ক্রমবর্ধমান মাত্রায় নতুন যুগের নারীরা দেখা দিয়েছে, যারা ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে পরিচয় দিয়েছে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও স্বকীয়তার। এর জন্য দুই দশক অথবা তার চেয়েও বেশি সময় লেগেছিল তার দৃষ্টিভঙ্গির তাৎপর্যপূর্ণ রূপান্তর হতে।

শেষ পর্যন্ত ১৯৩৬ সালে লেখা *চিত্রাঙ্গদা* গীতিনাট্যে তিনি তাঁর চূড়ান্ত কথাটি বলেছেন। বস্তুত, চিত্রাঙ্গদা চরিত্রে যে বলিষ্ঠতা এবং নারী-পুরুষের সমকক্ষতার চিত্র অঙ্কন করেছিলেন, তা শুধু তখনকার পরিপ্রেক্ষিতে নয়, তার সমগ্র রচনার মধ্যেই তা ব্যতিক্রমী বলে মনে হয়।

আমি চিত্রাঙ্গদা,...
নহি দেবী, নহি সামান্যা নারী।
পূজা করি মোরে রাখিবে উর্ধ্বে সে নহি নহি,
হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে সে নহি নহি।
যদি পার্শ্বে রাখ মোরে সঙ্কটে সম্পদে,
সম্মতি দাও যদি কঠিন ব্রতে সহায় হতে
পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে।

অর্জুনকে উদ্দেশ করে চিত্রাঙ্গদা যা বলেছিলেন, বিনা ব্যাখ্যাতেই তা দ্ব্যর্থহীন, আজও তা আধুনিক। আজও তা নারীদের কাঙ্ক্ষিত বস্তু। সমকক্ষতার ভিত্তিতে প্রেমের এই আদর্শ *চিত্রাঙ্গদা* প্রকাশিত হওয়ার পর প্রায় আট দশক কেটে গেলেও বাঙালি সমাজে এখনো ব্যাপক ভিত্তিতে শিকড় গাড়তে পারেনি।

কেবল সৃজনশীল রচনায় নয়, ১৯২০-এর দশকে তাঁর প্রবন্ধেও পুরুষের হাতে নারীর শোষণ ও নির্যাতনের কথা তিনি স্পষ্ট করেই বলেছিলেন। ১৯২৫ সালে প্রকাশিত 'হিন্দুবিবাহ' নামে প্রবন্ধে যেমন। এতে তিনি বলেছেন, 'প্রেয়সীরূপিণী নারীর এই আনন্দশক্তিকে পুরুষ লোভের দ্বারা আপন ব্যক্তিগত ভোগের পথেই আজ পর্যন্ত বহুল পরিমাণে বিক্ষিপ্ত করেছে, বিকৃত করেছে, তাকে বিষয়সম্পত্তির মতো নিজের ঈর্ষাবেষ্টিত সংকীর্ণ ব্যবহারের মধ্যে বন্ধ করেছে।' সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবাহ সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন, তাও এই উক্তির প্রতিধ্বনি। এই উপলব্ধি থেকেই তিনি তাঁর সৃজনশীল রচনায় ক্রমবর্ধমান মাত্রায় নারীপ্রগতির কথা বলেছেন।

শিক্ষা নারীপ্রগতির একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। বিশ শতকের গোড়ার দিকে তিনি যেসব নারীচরিত্র অঙ্কন করেছেন, তারা কতটা আনুষ্ঠানিক কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভ করেছে, তার কোনো উল্লেখ তিনি করেননি। কিন্তু তাই বলে তারা বৈদগ্ধ্যবর্জিত নয়। *গোরার* নারীরা তো রীতিমতো মননশীল আলোচনায় যোগদান করে। এই নারীরা শিক্ষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাবকেই প্রতিফলিত করে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অথবা ডিগ্রির প্রতি তাঁর তেমন কোনো আগ্রহ ছিল না; তিনি তেমন শিক্ষারই সমর্থক ছিলেন, যা ব্যক্তিত্ব, চরিত্র ও বৈদগ্ধ্যের বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করবে। এ কারণেই তাদের আলাপ-আলোচনা, আচার-ব্যবহার থেকে আনন্দময়ী, সুচরিতা, ললিতা, মৃণালিনী, কল্যাণী, হৈমন্তী, কুমু প্রমুখ সবাইকে সংস্কৃতিমান ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে দীপ্যমান মনে হয়। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাদের নিজস্ব বক্তব্য আছে। কেউ কেউ—সেকালের জন্য যা ছিল অপ্রত্যাশিত—রাজনীতি-সচেতন। যেমন—*চার অধ্যায়* উপন্যাসের এলা ও 'বদনাম' গল্পের সৌদামিনী। এমনকি, সোহিনীর মতো বিজ্ঞান-সচেতন চরিত্রও লক্ষ করি তাঁর শেষ দিকের রচনায়। এই বিজ্ঞানমনস্কতা সেকালে কেন, একালেও নারীদের মধ্যে দুর্লভ।

কিন্তু তাঁর শেষ দিকের নায়িকাদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় অনেক এগিয়ে যেতে দেখি। এদের কেউ কেউ—যেমন, *শেষের কবিতার* লাবণ্য ও *চার অধ্যায়*-এর এলার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিও আছে। এমনকি, *দুইবোন*-এর ঊর্মিমালাকে ইউরোপে যেতে দেখি উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে।

শিক্ষার মতো তিনি নিজেই যেমন আনুষ্ঠানিক ধর্ম থেকে ধীরে ধীরে সরে গিয়েছিলেন, তাঁর শিক্ষিত নারীদের মধ্যেও সেই প্রবণতা ও পরিবর্তন লক্ষ করি। *গোরা* উপন্যাসের তরুণী নায়িকা সুচরিতা অথবা তার ছোট বোন ললিতাই নয়, প্রৌঢ়া নারী আনন্দময়ীর মধ্যেও এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, যদিও তাঁরা তিনজনই এমনিতে ধার্মিক—উদার ও মানবধর্মে। *গোরা* উপন্যাস লেখা হয় ১৯০৭ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে। কিন্তু এর পরে, বিশেষ করে শেষের দিকের নায়িকারা ধর্ম সম্পর্কে আরও ঔদাসীন্য দেখায়। যূথবদ্ধভাবে আনুষ্ঠানিক ধর্মে আনুগত্য দেখানোর তুলনায় ধর্মকে মানুষের ধর্ম হিসেবে বিবেচনা করার এই মনোভাব নিঃসন্দেহে আধুনিকতার দিকে অগ্রযাত্রা।

নর-নারীর সম্পর্কের ক্ষেত্রেও তিনি পরিবর্তনের আভাস দিয়েছিলেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তাঁর রচনাতেই প্রথমবারের মতো এমন নারী দেখা গেল, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছাড়াও যারা একজন পুরুষের সঙ্গে অসংকোচে বন্ধুভাবে কথাবার্তা বলতে পারে এবং পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা নিয়ে একসঙ্গে কাজ করতে পারে। তিনি যে বিবাহপূর্ব এবং বিবাহ-অতিরিক্ত নারী-পুরুষের সম্পর্ক অঙ্কন করেছেন, তাও বাংলা আধুনিক সাহিত্যে খুব সম্ভব নতুন। আরও একটা জায়গায় রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতার দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন, একক পরিবারের চিত্র অঙ্কন করে। এই পরিবেশ নারীদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটার পক্ষে অনুকূল।

কিন্তু সমসাময়িক কালে পরিবারের ওপর যে অর্থনৈতিক চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তারা তার মুখোমুখি হয়নি। অথবা অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের বিষয়ে তারা একেবারে উদাসীন, এ কথা তারা ভাবেইনি। শিক্ষা যেমনই হোক না কেন, তাঁর নারীদের মধ্যে *শেষের কবিতার* লাবণ্য ছাড়া কেউই চাকরি করে না, অথবা তার কথা চিন্তাও করেনি। অথচ নারীমুক্তির একটা প্রধান শর্ত যে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা, রবীন্দ্রনাথ যখন কিশোর, তখনই তা লেখা হয়েছিল *জ্ঞানাঙ্কুর* পত্রিকায়—এ পত্রিকায় তিনিও লিখেছিলেন। কাজেই পত্রিকাটি তাঁর অপরিচিত ছিল না। *জ্ঞানাঙ্কুর*-এর সম্পাদক লিখেছিলেন যে, জীবিকার জন্য স্বামীর ওপর নির্ভরশীল না হলে মহিলাদের কোনো অপমান ও অসম্মান অথবা শারীরিক নিগ্রহ সহ্য করতে হবে না। এ রচনা যখন প্রকাশিত হয়, তখন তিনি নিতান্ত তরুণ ছিলেন—এ যুক্তি অবশ্য তাঁর পক্ষে দেওয়া যায়। কিন্তু পরের দশকে *সোমপ্রকাশ* (১৮৮২) ও *নব্যভারত* পত্রিকায়ও (১৮৮৫) এ রকমের মতামত প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি তখনো এ বিষয়কে গুরুত্বের সঙ্গে ভেবেছিলেন বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

অথচ ১৮৯০ ও ১৯০১-এর দশকে নারীরাও এ কথা ভাবতে আরম্ভ করেছিলেন—প্রথমে কৈলাসবাসিনী দেবী, তারপর রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। কৃষ্ণভাবিনী দাস *সাহিত্য* ও ঠাকুরবাড়ির পত্রিকা *ভারতী*তে লিখতেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধ পড়লেও, তাকে কোনো গুরুত্ব দেননি। ১৮৯১ সালের অক্টোবর মাসে কৃষ্ণভাবিনী দাস 'শিক্ষিতা নারী' নামে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তার দীর্ঘ সমালোচনা লেখেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন যে, 'পুরুষের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া অর্থোপার্জন স্ত্রীলোকের কার্য নহে।' কৃষ্ণভাবিনী এর উত্তর দিলে রবীন্দ্রনাথ তার প্রত্যুত্তর দেন, তবে তাঁর প্রত্যুত্তরে কোনো সারবস্তু ছিল না। (প্র. পা. ৩/১৯৪-০৫)। সমাজে নারীর স্থান নিয়েও কৃষ্ণভাবিনীর সঙ্গে তাঁর বিতর্ক হয়। (ঐ, ২৫৪)

এ সময়ে লেখা *পঞ্চভূতের ডায়রি*তেও তিনি তাঁর দুই নারীচরিত্রের মুখ দিয়েই বলিয়েছেন যে, শেষ পর্যন্ত পুরুষই শ্রেষ্ঠ। এ ছাড়া, কৃষ্ণভাবিনীর 'অশিক্ষিতা ও দরিদ্রা নারী' প্রবন্ধ নিয়েও তাঁর সঙ্গে তাঁর তৃতীয় বিতর্ক হয়। রবীন্দ্রনাথ পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব সমর্থন করে বক্তব্য দেন। 'আমার মনে হয় স্বশ্রেণীর শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে অতিমাত্র সচেতন না হইয়া নিরভিমান ও সহজভাবে আত্মকর্তব্য সম্পন্ন করিয়া যাওয়ার মধ্যে একটি সুন্দর শ্রেষ্ঠতা আছে; আজকাল নারীগণ সেই শ্রেষ্ঠতা হইতে বিচ্যুত হইবার আয়োজন করিতেছেন।...নারী বলিয়াই শ্রেষ্ঠ, তিনি পুরুষের কার্যে হস্তক্ষেপ করিলেই যে শ্রেষ্ঠতর হইবেন তাহা নহে বরং বিপরীপ ঘটিতে পারে; তাহাতে তাহাদের চরিত্রের কোমলতা, সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তার সামঞ্জস্য নষ্ট হওয়া আশ্চর্য নহে...।' (ঐ, ২০০) লক্ষ করার বিষয় হলো, এখানে তিনি পুরুষ ও নারীর কর্মক্ষেত্রকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং পুরুষই নারীর তুলনায় শ্রেষ্ঠ বলে ধরে নিয়েছেন। আর নারীর কোমলতা ও সহিষ্ণুতার প্রশংসা করেছেন। এই দুই গুণ থাকলে পুরুষদের পক্ষে নারীদের শোষণ করা সহজ হয়।

পরের দশকে—১৯০৫ সালে—কৃষ্ণভাবিনীর চেয়েও বলিষ্ঠ একজন নারীবাদী রোকেয়ার *মতিচূর* গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে একাধিক প্রবন্ধে তিনি নারীদের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার কথা বলেন। তার চেয়েও বেশি তিনি বলেন যে, মেয়েরা পুরুষদের সমান। পরে *সুলতানার স্বপ্ন* গ্রন্থে নারী-পুরুষের সামাজিক ভূমিকা উল্টে দিয়ে নারীদের শ্রেষ্ঠত্বের ছবিও অঙ্কন করেছিলেন। তিনি *মতিচূরে* লিখেছিলেন যে, নারীরা সব কাজই করতে পারে—ভাইসরয়ের কাজ থেকে কেরানিগিরি পর্যন্ত। এমনকি, মাঠে গিয়ে কৃষিকাজও করতে পারে। কেবল তা-ই নয়, তিনি মেয়েদের এই বলে উৎসাহিত করেছেন যে, তাদের সব কাজই করতে হবে এবং নিজেদের পরিচিত করতে হবে পুরুষ-নির্ভরতাবর্জিত একজন ব্যক্তি হিসেবে। *মতিচূর* প্রকাশিত হওয়ার অল্প পরেই এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করতে হয়েছিল। তার মানে, বইটি অনেকেই পড়েছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন বলে মনে হয় না। এটা আশ্চর্যের বিষয় যে, এ রকম একজন গুরুত্বপূর্ণ লেখিকার কথা তিনি কোথাও উল্লেখ পর্যন্ত করেননি, যদিও তিনি তরুণদের লেখা পড়ে অনেককেই উৎসাহ দিয়েছিলেন।

রোকেয়া মারা যান ১৯৩২ সালে। সেই তিরিশ দশকেও রবীন্দ্রনাথ নারীদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের আদর্শ মেনে নিতে পারেননি। অথচ তিনি এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন যে, নারীদের তুলনায় পুরুষেরা নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করে এবং নারীকে নির্যাতনের সাহস পায় অর্থবল আর বাহুবল দিয়ে। ১৯২৫ সালে তিনি এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন যে, 'নারীকে ইতর ভাষায় অপমান করতে পুরুষ কুণ্ঠিত হয় না। কেননা পুরুষ এখনো মনে করে যে সেই হলো মানুষ।' এখানে রবীন্দ্রনাথ পুরুষদের ইতর ভাষারই নিন্দা করেছেন, কিন্তু তারা যে নারীদের রীতিমতো শারীরিক নির্যাতন দিতে পারে এবং দিয়ে থাকে, তা বলেননি। পুরুষদের এই আধিপত্যের অবস্থানে যে টনক নড়তে পারে, নারীরা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বনির্ভর হলে—এটা তিনি লেখেননি অথবা অথবা হয়তো মনেই করতেন না যে, নারীদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের ফলে এটা সম্ভব হতে পারে। এই জন্য পুরুষদের একচেটিয়া অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে নারীদের সংগ্রামকে তিনি গুরুত্বপূর্ণ নয় বলে অভিহিত করেছেন, এমনকি, প্রথম দিকে তার নিন্দাও করেছেন।

এমনকি, তাঁর কোনো কোনো রচনা পড়লে সন্দেহ হয় যে, তিনি পুরুষ ও নারীর সমকক্ষতায় বিশ্বাস করতেন না। ১৯২৮ সালে লেখা 'হিন্দুবিবাহ' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন: 'সাহিত্য, কলা বা বিজ্ঞান প্রভৃতিতে মেয়েদের যথেষ্ট পরিমাণে দেখতে পাওয়া যায় না তার কারণ অনেকে অনেক রকম নির্ণয় করেন।...তোমার লেখায় গান সম্বন্ধে মেয়েদের বিশেষ শক্তির উল্লেখ করেছ। একটা কথা ভুলেছ—মেয়েরা গান গেয়েছে, গান সৃষ্টি করেনি।' এ উক্তি নারীদের প্রতিভা ও সামর্থ্যকেই অস্বীকার করার শামিল। কিন্তু নারীদের তিনি আরেক অর্থে নিন্দাও করেননি। কেবল বলেছেন যে, নারীর ভূমিকা আর পুরুষের ভূমিকাই আলাদা। কাব্যিক ভাষায় তিনি উপমা দিয়ে লিখেছেন যে, 'লড়াইতে বাঁ হাত ধনুকটাকে ধরে রাখে ডান হাত শরটাকে প্রক্ষিপ্ত করে। এ স্থলে দুই হাত একইভাবে একই কাজ করলে শক্তির ব্যাঘাত ঘটে।' ১৯৩৬ সালে—অর্থাৎ মৃত্যুর পাঁচ বছর আগেও তিনি এই সনাতন বিশ্বাসকে অস্বীকার করতে পারেননি যে, মেয়েদের প্রধান গুণ 'হৃদয়ধর্ম ও সেবানৈপুণ্য'। আর পুরুষের দাসত্ব মেনে নেওয়া তাদের স্বভাবের মধ্যেই নিহিত আছে। 'মেয়েদের নিজের স্বভাবেই বাঁধনমানা প্রবণত আছে, সেইজন্যে' পুরুষদের পক্ষে তাঁদের বন্দী করে শোষণ করা অত সহজ হয়েছে।

'হৃদয়ধর্ম ও সেবানৈপুণ্য'-এর মতো গুণাবলি দিয়ে তিনি 'নারীত্ব'কে আদর্শায়িত করে তুলেছিলেন। 'নারীত্ব' তাঁর মতে, 'ভালোবাসা, সহিষ্ণুতা এবং আত্মত্যাগের প্রতীক'। তিনি সেই আদর্শকে গৌরবান্বিত করে তাবৎ পুরুষের শোষণ ও অন্যায় শাসনকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। তাঁর মতে, তিনিই আদর্শ নারী, 'যিনি সারা জীবনের ত্যাগের বিনিময়ে পুরস্কার হিসেবে কেবল দুঃখের পবিত্র মহিমাকে অর্জন করেন।'

এই যে সৃজনশীল রচনায় *চিত্রাঙ্গদার* মতো নারী-পুরুষের সমকক্ষতার কথা বলেছেন এবং কোনো কোনো নারীকে অঙ্কন করেছেন বিদ্রোহী হিসেবে, সেই রবীন্দ্রনাথই ব্যক্তিজীবন ও তাঁর মননশীল রচনায় পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব এবং নারীর বশ্যতা, প্রেম, সহিষ্ণুতা ও আত্মত্যাগকে গৌরবান্বিত করেছেন। এ তাঁর স্ববিরোধিতা ও সীমাবদ্ধতা।

তবে স্বীকার করতে হবে সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের তো কথাই নেই, তাঁর সমকালীন অন্য কোনো সাহিত্যিক অথবা ভাবুক বাঙালি নারীদের অবরোধ ও ব্যক্তিত্ব বিকাশে তাঁর মতো অবদান রাখতে পারেননি। তিনি নারী-প্রগতির বহু দৃষ্টান্ত স্থাপন করে এবং তাঁর সর্বত্রগামী রচনা দিয়ে যেভাবে নারীমুক্তিকে উৎসাহিত করেছিলেন, তা বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত তুলনাহীন। কারণ, তাঁর চিন্তা ও কর্মজীবনের প্রভাব পড়েছিল বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রে। সেই সূত্র ধরে নারীদের শিক্ষা, চিন্তাধারা, রুচি ও জীবনযাত্রায় তিনি যত অনুকরণযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পেরেছিলেন, সমাজের ওপরতলার একটা বিশেষ মহলে চলাফেরা করতেন বলে সত্যেন্দ্রনাথ অথবা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তা পারেননি।

সত্যেন্দ্রনাথ বা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কেন, সমকালীন অন্য কোনো লেখক অথবা ব্যক্তিই অজস্র রচনা এবং নারীমুক্তির দৃষ্টান্ত স্থাপন করে নারীদের অবস্থার উন্নতির জন্য রবীন্দ্রনাথের মতো অবদান রাখতে সমর্থ হননি। এটা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল তাঁর অসামান্য প্রতিভা দিয়ে সাহিত্য, সংগীত, নাটক, নৃত্যনাট্য ইত্যাদির মাধ্যমে তিনি যেভাবে বাঙালি সমাজকে প্রভাবিত করেছিলেন, তারই দরুন।

## রবীন্দ্রনাথের কথাসাহিত্যের নায়িকাদের বয়সের ছক

| **রচনাকাল** | **নায়িকার নাম** | **রচনার শিরোনাম** | **যে বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত** | **মন্তব্য** |
|---|---|---|---|---|
| ১৮৮৪ | কুসুম | ঘাটের কথা | ৭ | |
| ১৮৯২ | সুরবালা | একরাত্রি | ৮ | |
| ১৮৯৩ | মহামায়া | মহামায়া | ২৪ | কুলীনকন্যা |
| ১৮৯৩ | হরসুন্দরী | মধ্যবর্তিনী | ৮ | |
| ১৮৯৩ | মৃণ্ময়ী | সমাপ্তি | বালিকা | |
| | উমা | খাতা | ৯ | |
| ১৮৯৫ | সোনামণি | অতিথি | ৫ | |
| ১৮৯৯ | কুমু | দৃষ্টিদান | ৮ | |
| ১৮৯৯ | হেমাঙ্গিনী | দৃষ্টিদান | ১৫ | কুলীনকন্যা |
| ১৯০০ | শশী | দুর্বুদ্ধি | ১৩ | |
| | | যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ | ১১ | |
| ১৯০৩ | নির্ঝরিণী | দর্পহরণ | ১২ | |
| ১৯০৩ | কুড়ানী | মাল্যদান | ১৬ | অপরিণত দেহ |
| ১৯০৩-০৫ | হেমনলিনী | *নৌকাডুবি* | ১৭-১৮ | ব্রাহ্ম |
| ১৯০৭-১০ | সুচরিতা | *গোরা* | ১৭-১৮ | ব্রাহ্ম |
| | ললিতা | *গোরা* | ১৩-১৪ | ব্রাহ্ম |
| ১৯১৪ | কল্যাণী | অপরিচিতা | ১৬ | পশ্চিমে মানুষ |
| ১৯১৮ | দীপালি | পাত্রপাত্রী | ২৫ | সঙ্করবিবাহজাত কন্যা |
| ১৯২৭-৮ | কুমু | *যোগাযোগ* | ১৯ | |
| ১৯২৮-২৯ | লাবণ্য | *শেষের কবিতা* | ২৪-২৫ | পাশ্চাত্য-প্রভাবিত |
| | কেতকী | *শেষের কবিতা* | ২৪-২৫ | পাশ্চাত্য-প্রভাবিত |
| ১৯৩২-৩৩ | উর্মিমালা | *দুইবোন* | ২৪-২৫ | উচ্চশিক্ষিত |
| ১৯৩৪ | সরলা | *মালঞ্চ* | ৩০ | |
| ১৯৩৪ | এলা | *চার অধ্যায়* | ২৯ | উচ্চশিক্ষিত ও বিপ্লবী |